দাম : দশ টাকা

জাতীয় বিপ্লববাদের উত্তরণ : মহাবিপ্লবী রাসবিহারী
পৃঃ - ৪৩

স্বস্তিকা

সাভারকর এক ভাস্বর, মহান, অপরাজিত বীর
পৃঃ - ৪৫

৭০ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২১ মে ২০১৮।। ৬ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

হাজার হাজার হিন্দু হত্যা করে ভারত ভাগ করেছে

মহম্মদ আলি জিন্না

তার ছবি কেন শোভা পাবে ভারতবর্ষে?

কলকাতায় হিন্দু নিধন।

ঢাকায় হিন্দু হত্যা।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২১ মে - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

রক্তাক্ত বাংলায় উন্নয়নের ভোট

▯ রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৬

খোলা চিঠি : ব্যালট তোমায় গান স্যালুট

▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

অর্থ কমিশন বৈষম্য করছে— এ অভিযোগ ঠিক নয়

▯ সুশীল মোদী ▯ ৮

ভারতের ইতিহাসে এক ঘৃণিত চরিত্র জিন্না

▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১১

জিন্নার মামদো ভূত ভারতে চাকু নাড়ছে

▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১৩

বামৈস্লামিক — বামপন্থার নব্য রূপ ▯ স্বনাম গুপ্ত ▯ ১৫

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : আমরা নূতন যৌবনের ভূত ▯ ১৭

সারারাত আল্লাহ্ হো আকবর, সকালে শকুনের ভোজ

▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ২৩

ভ্রমণ : পাহাড়কাটা ভাস্কর্যে অনুপম ঊনকোটি

▯ নীলাঞ্জনা রায় ▯ ২৬

ত্রিপুরার পৌরাণিক ইতিহাস ▯ সৌরিশ দেববর্মন ▯ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

গল্প : প্রতিহন্তা ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫

জাতীয় বিপ্লববাদের উত্তরণ : মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

▯ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ৪৩

সাভারকর এক ভাস্বর, মহান, অপরাজিত বীর

▯ রাজর্ষি সেনগুপ্ত ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯

সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ **এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯

নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **খেলা : ৪১**▯

রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কর্ণাটকে বিজেপি

যেমনটা আশা করা গিয়েছিল সেভাবেই কর্ণাটকের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় দল হিসেবে উঠে এল বিজেপি। কর্ণাটকের সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে ১০৪টি আসনে। জাতপাতের রাজনীতি, লিঙ্গায়েত তাস— বিজেপির জয়ের পথে কাঁটা বিছানোর চেষ্টা কম হয়নি। কিন্তু জনতার আদালতে সেসব ধোপে টেকেনি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার আকর্ষণ— বিজেপির কর্ণাটক বিজয়। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

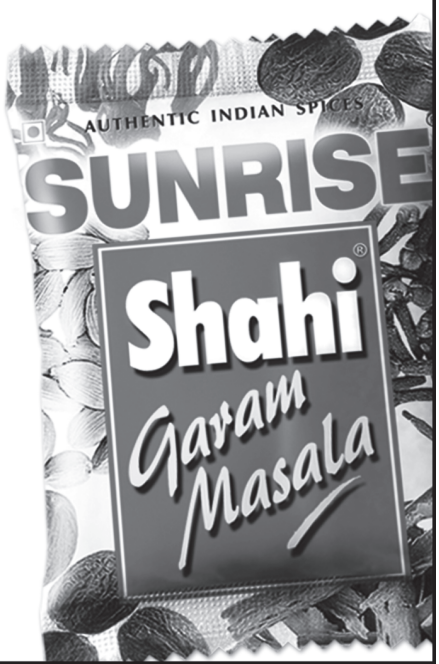

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ছিঃ!

বহু ব্যবহারে ক্লিশে হইয়া যাওয়া সেই শব্দ-বন্ধনীই পুনরায় ব্যবহার করিতে হইতেছে—২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন পূর্ণ মাত্রায় প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। চিত্রনাট্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক নিয়োজিত সিভিক ভলান্টিয়ারের নিরাপত্তার ভরসায় ভোট করিলে, তাহা কিরূপ 'অবাধ' হইবে তা অনুমানের জন্য জ্যোতিষ বিদ্যার প্রয়োজন পড়ে না। কার্যক্ষেত্রে তাহাই দেখা গিয়াছে। নির্বাচনের দিন তাজা উনিশটি প্রাণের বিনিময়ে ও অজস্র রক্ত ঝরাইয়া গণতন্ত্রের উৎসবটি বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করিল। এই বিভীষিকার মধ্যে আরও কয়েকটি করুণ সত্য উঠিয়া আসিয়াছে। যেমন নীচু তলার প্রতি ঊর্ধ্বতন তৃণমূল কর্তৃপক্ষের কোনও নিয়ন্ত্রণ নাই। তাহার চাইতেও বড় কথা ইহাদের গুণ্ডামিকে রুখিবার জন্য কোনও সদিচ্ছা তৃণমূলী কর্তৃপক্ষের তো নাই-ই, উপরন্তু পুলিশ-প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রাখিয়া এই দুষ্কৃত-কর্মকে মদতদানের পথও সুগম করা হইয়াছে। ভোট-পূর্ব আরাবুল কাণ্ডে প্রমাণ হইয়াছিল তৃণমূলে দুষ্কৃতীরাজ স্বমহিমায় বিরাজমান। আরাবুল গ্রেপ্তারে যাঁহারা মুখ্যমন্ত্রীর রাজধর্মের গুণগান করিতেছিলেন তাঁহারা ভোটের দিন আরাবুলবাহিনীর হস্তে গণতন্ত্রের লাঞ্ছনার সাক্ষীও রহিলেন। আবার ভোটযুদ্ধে ছয় তৃণমূল কর্মীর মর্মান্তিক হত্যার দৃশ্যও আমাদের দেখিতে হইল।

ইহাতে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধী দলের যত না হাত রহিয়াছে, তাহার কয়েকগুণ বেশি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই এই তাজা প্রাণগুলিকে নিকাশ করিয়া দিয়াছে। এই নির্বাচন প্রমাণ করিয়াছে তৃণমূল বলিয়া কোনও রাজনৈতিক মঞ্চের অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে তাহা হইল সরকারে থাকিবার সুবাদে প্রশাসনকে পঙ্গু করিয়া দুষ্কৃতীরাজের মাধ্যমে ক্ষমতার আস্ফালন জাহির করা এবং তাহা টিকিয়া রাখিবার সুবন্দোবস্ত করা। ভোটের লাইনে রিগিং করিতে যাইয়া এক স্নাতকোত্তর পাশ যুবক গণপিটুনিতে হত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়েরা জানাইয়াছে বিধায়ক প্রদত্ত চাকরির লোভেই শিক্ষিত যুবকটি গণতন্ত্রের পক্ষে অমন অশুভ কাণ্ডটি ঘটাইতে গিয়াছিল। প্রাণের বিনিময়ে তাহার মাশুল সে দিয়াছে, কিন্তু নির্মম সত্যটিই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে শিক্ষিতই হউক বা লেখাপড়া না জানা গরিব-গুর্বো মানুষই হউক তাহাদের দুষ্কৃত-কর্মে দীক্ষা না দিলে তৃণমূল নামক রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাটি টিকিবে না। বাংলার হাল বামফ্রন্টের সঙ্গে যৌথ কৃতিত্বে তাঁহারা যা করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্নে বিভোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দেশের ভার ন্যস্ত হইল ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিতে পাকিস্তান বা চীনের আর দরকার হইবে না; মমতা-ইয়েচুরি-রাহুলেরাই তাহা সম্পন্ন করিবেন।

আজকের সন্ত্রাসের আবহে এবিষয়ে কংগ্রেস-সিপিএমের অবদানের কথা ভুলিলেও চলিবে না। ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করিবার উপায় সর্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বীয় কীর্তির ধ্বজা ধরিয়া ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাহা তাহাদের চৌত্রিশ বছরের রাজত্বে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছল। মার্কসবাদ বিজ্ঞান, তাই তাহাদের বৈজ্ঞানিক রিগিং কেবল বিরোধী অভিযোগ ছাড়া অন্যত্র প্রমাণিত না হইলেও তাহাদের প্রদর্শিত পথেই আজ তৃণমূল বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট ইত্যাদির আয়োজন করিতেছে। কেবল এই কাজে তাহাদের বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিবর্তে স্থূল মস্তিষ্ক ও বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমের বহুল সক্রিয়তায় গণতন্ত্রের ধ্বংসলীলা ফাঁস হইয়া যাইতেছে।

সুতরাং গণতন্ত্রের হত্যাকারী হিসাবে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-তৃণমূলের অবদান কারও চাইতে কোনও অংশে কম নয়, তাই ইহারা দিল্লিতে একজোট হইলে তাহা গণতন্ত্রের পক্ষে অশনি সংকেতই বটে। ইহা কেবল আমাদের ইতিহাসের শিক্ষাই নহে, সারদা-মামলায় কংগ্রেসের তাবড় তাবড় মন্ত্রীদের ওকালতি এই কথাই জানান দেয় তৃণমূল-কংগ্রেস-সিপিএম একইবৃন্তে তিনটি পুষ্পমাত্র। তবে সিপিএমের সবচাইতে মেধাবী ছাত্রীটি একটি ব্যাপারে তাহার গুরুদেবকে টপকাইয়া গিয়াছে, বাম আমলে নির্বাচন কমিশন সিপিএমের অনুগত হইলেও সম্পূর্ণ পার্টি-অফিসে রূপান্তরিত হয় নাই, আজ তাহারা তৃণমূলের শাখা-সংগঠনে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের জন্য বাংলা অভিধানে একটি শব্দই বরাদ্দ রহিয়াছে। শব্দটি হইল ছিঃ!

সুভাষিতম্

উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।

ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশ্যন্তি মুখে মৃগাঃ।। (হিতোপদেশ)

ঘুমন্ত সিংহের মুখে যেমন আপনা থেকেই মৃগ প্রবেশ করে না, তেমনি শুধুমাত্র ইচ্ছার দ্বারাই কোনও কার্যসিদ্ধ হয় না। তা উদ্যমের দ্বারাই সম্পন্ন করতে হয়।

রক্তাক্ত বাংলায় উন্নয়নের ভোট

রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে আমাদের রাজ্যে সমাপ্ত হলো গণতন্ত্রের আরও এক উৎসব—ভোট—ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। ফলাফল কী হতে চলেছে তা যাঁরা ভোট দিতে গিয়েছিলেন তাঁরা ছাড়াও সংবাদমাধ্যমের দৌলতে অনেকেই বুঝে গেছেন। উন্নয়নের ভোট হলো, আর এ উন্নয়ন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল উন্নয়ন খড়্গ হাতে এগিয়ে আসা এক দৈত্যের মতোই। যার সামনে দাঁড়ালেই মৃত্যু অবধারিত। তাই হয়তো সেদিন রাত এগারোটা অবধি মৃত্যু তালিকায় উনিশজনের নাম নথিভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি জানি এই তালিকায় আরও নাম হয়তো যুক্ত হবে। কারণ বহু মানুষ উন্নয়নের খড়্গের আঘাতে ধুঁকছে হাসপাতালে। তারা না চাইলেও তাদের হয়তো চলে যেতেই হবে। আবার কিছু জায়গায় উন্নয়নের রাস্তায় কিছু পাথরের মতো প্রতিবাদ উঠে উন্নয়নকে ঘুরে যেতে বাধ্য করেছিল। এবার তাদের হয়তো বাছাই করা হবে। যাতে ভবিষ্যতে উন্নয়ন না আটকায়। তাই তাদের কারুর নামও যুক্ত হবে ওই তালিকায়। তাই তালিকায় সংখ্যা বাড়বে।

এক অপদার্থ নির্বাচন কমিশনার ও এক স্বৈরাচারী মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একদিনেই হারিয়ে গেল কতগুলো জীবন। কতজন যে আহত হয়েছেন তার কোনও হিসেব নেই। বিরোধী প্রার্থী বা তাদের সমর্থকদের রক্ত তো বইলই তার সাথে নিরীহ জনসাধারণ, যারা গণতন্ত্রের জন্য বেরিয়ে এসেছিল তাদের অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় চোট পেলেন। আমার খারাপ লাগছিল যখন টিভির পর্দায় দেখলাম, একজন মহিলা অঝোরে কেঁদেই চলেছেন, তাঁর ডান পায়ে যথাসম্ভব বোমের স্প্লিন্টার ঢুকে গেছে। বেচারা মহিলা হয়তো মা-মাটি-মানুষের উন্নয়নের ছোঁড়া বোমায় তার পায়ে ক্ষত নিয়েই আজীবন বাঁচবেন। তার কান্নাও ভাসবে আকাশে বাতাসে।

সকাল থেকেই বুথ দখল করা থেকে শুরু করে মারধোর অবাধে চললো। নতুন জিনিস এবার দেখলাম বুথের ভিতরে সশস্ত্র পুলিশের সামনেই রিভলভার। দেখে মনে হলো 'দিশি ছক্কা' নিয়ে চমকানো আর পুলিশের কাঁধে আধুনিক এস এল আর মানে সেল্ফ লোডিং রাইফেল। যদি কাঁধ থেকে একবার নামাতো ওই পুলিশ কনস্টেবলটি, তাহলেই কিন্তু সবাই পগারপার হয়ে যেতো। কিন্তু না কোনও এক অজানা কারণে কাঁধের বন্দুক কাঁধেই রইলো আর বুথ দখল হলো। এরপর আর এক জায়গায় দেখলাম রিভলভার নিয়ে লুঙ্গি পরা এক উন্নয়নের বাহন গুলি চালাচ্ছে।

আবার দেখলাম, কলকাতার কাছেই জ্যাংড়ায় প্রকাশ্যে হলুদ জামা পরা এক যুবক পিস্তল থেকে গুলি চালাচ্ছে আবার কক করছে। ধরা আর কক করার স্টাইল জানায় মোটামুটি ভালো জাতের পিস্তল নিয়েই ঘুরছে।

আরেকটি ঘটনা দেখলাম আমরা, কোচবিহারের জেলা পরিষদ প্রার্থী আব্দুল জলিল আহমেদ বুথের বাইরে দাঁড়ানো ভোটারদের ধমকাচ্ছেন আব বুথের ভিতর ঢুকে নির্দল প্রার্থীর এজেন্টকে বার করিয়ে দিলেন নিজের সাঙ্গপাঙ্গ দিয়ে। আবার এক মন্ত্রী একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বহিরাগত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে বিজেপির কর্মীকে থাপ্পড় মারলেন।

চারিদিকেই সন্ত্রাস করে ভোট করানো ব্যালট বাক্স লুট, ভেঙে পুড়িয়ে দেওয়া, জলে ফেলে দেওয়া সবই ব্যাপকভাবেই চললো পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে। তবে সব পুলিশই আবার নিজের মনুষ্যত্ব, বিবেক আর পুলিশের গরিমা বেচে দেননি। তাঁদেরও ছবি আমরা দেখেছি— তারকেশ্বর থানার ওসি অদ্ভুতভাবে বুক ফুলিয়ে পুলিশের কর্তব্য পালন করে দেখালেন। এছাড়াও কিছু পুলিশ অফিসার নিজেদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকজন আজও হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন। তারা ব্যতিক্রম হয়েই রইলেন আমাদের কাছে।

তবে এই ভোটে আবার কোথাও কোথাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সাধারণ মানুষ। তার ফলে কোথাও বাইক জ্বলেছে, আবার কোথাও মানুষকে ভয় দেখাতে আসা বহিরাগত গণপিটুনিতে হত হয়েছে। এর মধ্যে এমএ পাঠরত যুবকের মৃত্যু মর্মান্তিক।

এসবের মধ্যেও অবাক লাগল টিভিতে বসা কিছু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল করা অধ্যাপক-শিক্ষকের লজ্জাহীন কথাবার্তা আর যুক্তির নামে ভুল তথ্য দিয়ে রক্তপাতের ঘটনাকে জাস্টিফায়েড করা। এনারা ছাত্রসমাজকে কী শিক্ষা দেন তা জানতে ইচ্ছা করে।

যাইহোক, এসবের পরে যখন শিক্ষামন্ত্রী জানান, ভোট মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ। তখন বুক কেঁপে ওঠে।

কেউ কেউ জানাচ্ছেন যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে টিএমসির লোক বেশি আছে। কী অদ্ভুত যুক্তি! টিএমসির লোক মারা গেছে মানে কি সন্ত্রাস হয়নি?

তবে স্বৈরাচারের শেষ আছে আর তার ঘণ্টা বেজে গেল এই ভোটে। একদিন কংগ্রেসের স্বৈরচারী মনোভাবের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষ সিপিএমকে এ রাজ্যে এনেছিল। তারপর সিপিএমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই তৃণমূলকে এনেছিল। আজ আবার মানুষের চোখ খুলছে। তাই এবার মমতা ব্যানার্জির সরকারের বিদায় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। অন্ধকার কেটে ভোরের আলো প্রায় আগত।

ব্যালট তোমায় গান স্যালুট

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

রক্তে ভেজা ১৪ মে, ২০১৮।

মমতা আপনি মুখ্যমন্ত্রী নন, দিদি নম্বর ওয়ান। দেখিয়ে দিলেন বাংলাকে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে রক্তের দাগ। তাতে আরও একটা পাতা সংযোজিত।

মনোনয়ন থেকে ভোটগ্রহণ, সব স্তরে দিকে দিকে একটাই নাম— তৃণমূল কংগ্রেস। দিকে দিকে একটাই প্রতীক— ঘাসফুল। দিকে দিকে একটাই স্লোগান— মা-মাটি-মানুষ জিন্দাবাদ।

এমন স্লোগানের মধ্যে এত মায়ের কান্না, রক্তে ভেজা মাটি, মানুষের আর্তনাদ আসলে যে ঘাসফুলের পবিত্র স্লোগানকেই কলঙ্কিত করল দিদি। হ্যাঁ, আপনি আজ মুখ্যমন্ত্রী নন, দিদি।

দিকে দিকে পোস্টারে পোস্টারে যতই আপনাকে 'মুখ্যমন্ত্রী নম্বর ওয়ান' বলা হোক, ভোট উপলক্ষে শাসক দলের 'দাদাগিরি' দেখে একটাই নাম মাথায় আসছে— আপনি মমতা 'দিদি নম্বর ওয়ান।'

আপনি বলবেন, হ্যাঁ নিশ্চিত বলবেন যে, মৃতের বেশির ভাগই আপনার দলের। মনোনয়ন পর্বেও তাই বলেছিলেন। কিন্তু দিদি, ওরা সবাই আসলে আপনার রাজ্যের মানুষ। সকলেই 'মা-মাটি-মানুষ'-এর অঙ্গ। যত রক্ত ঝরল সব রক্তই বাংলার।

কিন্তু দিদি আপনিই পারতেন এই রক্তপাত, এই প্রাণহানি বন্ধ করতে। আপনিই পারতেন। শান্তি চাইলে আপনি কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকতে পারতেন। আপনি কম সংখ্যক পুলিশকে দিয়ে বেশি দফায় ভোট করিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। দুষ্কৃতীরা যে দলেরই হোক, তারা আপনার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যেই হামলা চালিয়েছে, অশান্তি করেছে, প্রাণ নিয়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে।

মানতে আপনাকে হবেই। দিদি, মানতে হবেই। যে বিরোধীরা অস্ত্র তুলে নিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা, নিরস্ত করার দায়িত্ব তো আপনার প্রশাসনের হাতেই ছিল। আদালতে যে বাংলার মুখ পুড়েছে সেই বাংলা শুধু আপনার নয়, আমাদেরও। এই বাংলা সবার। ভোটগ্রহণে যে বাংলার গায়ে রক্তপাতের কালি লাগল, সেই বাংলাও আমাদের সবার। ভোট জয়ের সাফল্য আপনারই থাকবে, কিন্তু এই লজ্জার ভাগীদার আমরা সবাই।

এমন লজ্জা থেকে আপনি চাইলে বাংলাকে বাঁচাতে পারতেন। আপনিই পারতেন। কারণ, আপনিই তো বাংলার— 'দিদি নম্বর ওয়ান'। না, আপনি 'মুখ্যমন্ত্রী নম্বর ওয়ান' নন।

ভোট পর্ব দেখে মনে হলো, এর থেকে ভালো ছিল গোটা রাজ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়। যেখানে যার শক্তি বেশি সেখানে সেই যদি জিতে যেত, তবে এত লাশ দেখতে হতো না বাংলাকে। ভোটের অনেক আগে থেকে অনুব্রত মণ্ডলরা 'রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকবে' বলে হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন।

ক'দিন আগেই কর্ণাটকের ২২২ আসনে এক দিনে ভোট হয়েছে। একটিও প্রাণহানি ঘটেনি, অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন— বাংলায় কেন এমন হয় না?

আচ্ছা, বাংলায় হবে কেন? বাংলা তো বাংলাই। কং-আমল, বাম-জমানা— সব সময়েই বাংলায় ব্যালটকে 'গান-স্যালুট' জানানো হয়। এটা মোটেও নতুন কিছু নয়। কী বলছেন? 'পরিবর্তন'-এর বাংলায় সবই পরিবর্তিত হবে, এমন কথা কে দিয়েছে? বাংলার 'হিংসা-সংস্কৃতি' বজায় রাখা 'বদল' নয়, 'বদলা'-ও নয়।

—**সুন্দর মৌলিক**

অর্থ কমিশন বৈষম্য করছে এ অভিযোগ ঠিক নয়

অতিথি কলম

সুশীল মোদী

জি এস টি লাগু হওয়া ও পূর্বতন প্ল্যানিং কমিশন ভেঙে দেওয়ার পর ১৫তম অর্থ কমিশন এই প্রথম কাজ শুরু করেছে। এই দুটি বড় ধরনের ঘটনার অভিঘাতে একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কমিশনের কাজের পরিধি অর্থাৎ যে Terms of Reference (TOP) থাকে, এবারের ১৫তম অর্থ কমিশনে উল্লেখিত ঘটনাগুলির প্রতিফলিত হওয়ার ফলে একটা চ্যালেঞ্জের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুরুতেই দক্ষিণের কিছু রাজ্য থেকে প্রতিক্রিয়া দেখানো শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীরা এই সূত্রে তিরুবনন্তপুরমে মিলিত হয়ে তাঁদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন।

অন্যান্য কিছু বিষয় ছাড়া তাঁরা ২০১১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে রাজস্ব বিতরণের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে মূলত তারই বিরোধিতা করেছেন। কেননা তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী এরই ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। তারা জানিয়েছেন দক্ষিণের রাজ্যগুলি কেন্দ্রের ভাঁড়ারে বিভিন্ন আদায় সূত্রে যে টাকা জমা দেয় তার থেকে অনেক কম টাকাই তাদের কোষাগারে ফেরত আসে। কেন্দ্রের এই ফান্ডটির নাম 'Divisible pool of Taxes' সম্মিলিত আদায়ীকৃত করের বিতরণযোগ্য অংশ। নব নির্মিত অর্থ কমিশনের কার্যকলাপের পর্যালোচনা হতে পারে, কিন্তু রাজস্ব বিতরণে বৈষম্য করার অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন। যদি এমন হতো যে অর্থ কমিশন যে যে রাজ্য যে পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় কোষে দিয়েছে কেবলমাত্র সেই সেই অনুপাতেই রাজ্যগুলির মধ্যে বিতরণ করে দেবে, সামগ্রিকভাবে সমস্ত রাজ্যগুলির প্রয়োজন ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না, সেক্ষেত্রে কমিশন গঠনের কোনও দরকারই হতো না।

সংবিধানের নির্মাতারা দেশের রাজ্যভিত্তিক নানান অসাম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। যে কারণে তাঁরা অর্থ-কমিশনে প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখার ব্যবস্থা করেন যাতে প্রাদেশিক বৈষম্যগুলি দূরীভূত হয়। অর্থ কমিশনের রাজস্ব ভাগবাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে প্রাথমিক যুক্তিই হলো যতদিন এই প্রাদেশিক অসাম্য বজায় থাকবে ততদিনই দরিদ্র রাজ্যগুলি রাজস্বের বেশি অংশ পাবে। ১৫তম অর্থ কমিশনের লক্ষ্যের মধ্যেই রয়েছে, "inclusive growth in the country guided by the principles of equality, efficiency & transparency." সকলকে অঙ্গীভূত করে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানোর অর্থই হলো দেশের সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চল ও জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, যে রাজ্যগুলি দেশের রাজস্ব সংগ্রহাগারে বেশি অর্থ জমা করছে অথচ পরিবর্তে কম অংশ নিজেদের রাজ্যের খরচ হিসেবে পাচ্ছে, তারা অবশ্যই দেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ধনী রাজ্য। একটা কথা বলা দরকার ধনী রাজ্য ও গরিব রাজ্যের এই যে বৈপরীত্য এর সঙ্গে কিন্তু দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের রাজ্যগুলির কোনও বৈপরীত্য বলে কিছু বোঝায় না। মোটামুটিভাবে দেশের দক্ষিণভাগের রাজ্যগুলি তুলনামূলকভাবে ধনী। কিন্তু এই নিরিখে দেশের উত্তরাংশে ধনী ও দরিদ্র উভয় ধরনের রাজ্যই আছে। তাই যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, দক্ষিণের রাজ্যগুলি তাদের পাওনা যে রাজস্ব ছেড়ে দিল তার অংশ উত্তরের ধনীরাজ্য পঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র বা গুজরাট পেয়ে গেল। তাই যখন কেউ ধনী দরিদ্রের বিষয়টিকে উত্তর দক্ষিণের ছাঁচে ফেলে তুল্যমূল্য বিচার করতে চায় তখন সেটা সঙ্কীর্ণ নিজ স্বার্থরক্ষার খাতিরে জনতার সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। বলতেই হবে এর মধ্যে জাতীয় পরিচয়কে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য বিভাজনের বীজ সুপ্ত আছে।

এই সূত্রে দক্ষিণের রাজ্যগুলি ২০১১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে দেশের সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করা নিয়ে তাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। এটিও ন্যায়সঙ্গত নয়। মানতেই হবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দক্ষিণের রাজ্যগুলি যে কাজ করেছে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু উত্তরের কোনও কোনও রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং পঞ্জাব এরাও একইভাবে সফল হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই পথ অনুসরণ করছে না এমন নয়। তাই এতদিন পরে সেই প্রাচীন ১৯৭১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান ব্যবহার করাটা চলতি বাস্তবতাকে অস্বীকার করা শুধু নয়, সামাজিকভাবে অসুবিধায় থাকা রাজ্যগুলির ওপর এক নিদারুণ জরিমানা চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর। অর্থ কমিশনের টিওআর-এ কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ন্ত্রণ আনতে পারলেও, সঠিক বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারলে পুরস্কৃত করার শর্তও আছে।

সেক্ষেত্রে কী উত্তর, কী দক্ষিণ যারাই জনসংখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পারবে তারাই পুরস্কারের যোগ্য হবে।

ধনী রাজ্য হিসেবে কেন্দ্রের কোষে বেশি অর্থ জমা করা সত্ত্বেও অর্থ কমিশনের সুপারিশে তাদের তুলনায় কম অর্থ পাওয়া নিয়ে অভিযোগ অতীতে বহুবার উঠেছে। আজকের দক্ষিণের রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে প্রথম নয়। এখানে খেয়াল রাখতে হবে দেশের বড় বড় করপোরেট সংস্থাগুলির হেড অফিস কিন্তু প্রধানত Tier I বা মেট্রো শহরগুলিতে অবস্থিত, অর্থাৎ সেগুলি সবই ধনী রাজ্যের আওতায় পড়ে। আর তারা তাদের দেয় কর সবই এই রাজ্যগুলিতেই জমা দেয় যা কেন্দ্রের কাছে স্থানান্তরিত হয় আদায় হিসেবে। এই কোম্পানিগুলি কিন্তু যারা ভারত (Pan India) ব্যাপী তাদের ব্যবসা চালায় অন্তত বিক্রি বা অনেক ক্ষেত্রে মাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

এর অনুসারী হিসেবে তাই কখনই বলা যায় না যে, তাদের লাভের উৎস যে শহরগুলিতে তাদের প্রধান দপ্তর অর্থাৎ যেখানে তারা কর জমা দেয় কেবলমাত্র সেগুলিই। এই যুক্তিতে ধরতে গেলে এই করের একাংশ যে যে রাজ্যগুলিতে ওই করপোরেট সংস্থা কেনা বা বেচা বা যে কোনও স্তরে তাদের ব্যবসা করেছে তাদেরও পাওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে কেবল অর্থ কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যে কী অর্থ প্রদত্ত হচ্ছে সেটিই শুধু আলোচ্য নয়। অন্যান্য আরও যে উৎস থেকে অর্থ পৌঁছয় সেগুলিকেও ধরা দরকার। এমন অনেক উৎসই আছে। একটা ধরা যাক ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে অর্থের যে আদান প্রদান হয় তাকে ঋণ ও জমার অনুপাত বলে। এটা খুবই সহজবোধ্য দক্ষিণের ধনী রাজ্যগুলিতে এই অনুপাত অর্থাৎ ঋণজমা ক্রেডিট ডিপোজিট-এর অনুপাত ১০০ শতাংশ। গরিব রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত অর্থাৎ সিডি রেশিও ভয়ঙ্কর কম। সোজা কথায় গরিব রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলিতে গরিবের সঞ্চয় স্বাভাবিকভাবে কম, শিল্প উদ্যোগও কম। তাই ব্যাঙ্কগুলির সেই অর্থ থেকে ঋণ দেওয়ার টাকাও কম। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার ব্যাঙ্ক যে টাকা ওই দরিদ্র রাজ্যগুলিতে ঋণ হিসেবে খাটাতে পারল না সর্বভারতীয় স্তরে ব্যবসা করার কারণে তারা অন্য রাজ্যের শিল্পের বাড়তি অর্থের চাহিদা মেটাতে সেখানে তা ঋণ দিল। যদি সঠিকভাবে হিসেব কষা যায় তাহলে হয়তো অবাক হব না যদি দেখা যায় ব্যাঙ্কিং চ্যানেল দিয়ে যে টাকা ধনী রাজ্যগুলিতে লগ্নী হয়। অর্থ কমিশনের অর্থ বরাদ্দের থেকে সে অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বেশি।

শেষে বলা যায় যে ধনী রাজ্যগুলি মনে করছে অর্থ কমিশন সত্যিই তাদের প্রতি বৈষম্য করছে। সেক্ষেত্রে সেই রাজ্যগুলির নিজেদের খরচের প্রকৃতির ওপর একটু নজর ফেলা উচিত। এটা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় যে প্রত্যেক রাজ্যেরই তাদের ধনী জেলাগুলিতে সব রকমের কর সংগ্রহের পরিমাণ বেশি। সঙ্গে এও বলে দেওয়া যায় সেই জেলাগুলির পেছনে রাজ্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে তা নিশ্চিত তাদের রাজ্যকে দেয় করের অনুপাতে কম। এই সূত্রে সব সময় কাম্য হবে আন্তঃ জেলা ফারাক দূর করা বা কমিয়ে আনা। ঠিক তেমনি কেন্দ্র-রাজ্য রাজস্ব বিতরণের ভারসাম্য নিয়ে আসাটাও একই রকম প্রয়োজন। তাই এই তফাতের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ বা অন্য কোনও ভৌগোলিক ব্যবধান খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন।

(লেখক বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী)

“এটা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় যে প্রত্যেক রাজ্যেরই তাদের ধনী জেলাগুলিতে সব রকমের কর সংগ্রহের পরিমাণ বেশি। সঙ্গে এও বলে দেওয়া যায় সেই জেলাগুলির পেছনে রাজ্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে তা নিশ্চিত তাদের রাজ্যকে দেয় করের অনুপাতে কম। এই সূত্রে সব সময় কাম্য হবে আন্তঃ জেলা ফারাক দূর করা বা কমিয়ে আনা।”

রম্যরচনা

● আফ্রিকার মাসাইমারা প্রান্তরে এক বাঙালি নায়ক শুটিং করছেন। হঠাৎ ঘাস ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো বিশাল সিংহ। বাকি শিল্পীরা অনেক দূরে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তারা। অসহায় নায়ককে খেতে উদ্যত সিংহ। নায়ক করুণ গলায় সহশিল্পীদের চেঁচিয়ে বললেন, ''কলকাতায় খবরটা দিয়ে দিস। আমি আর নেই।'' সিংহ দাঁড়িয়ে গেলো, ''ব্যাটা ভাগাড়ের মাংস খাস!! ইসস্ আরেকটু হলেই জাত গেছিলো তোকে খেয়ে। ভাগ এখান থেকে।'' ফিরে গেল সিংহ। নায়ক হাত জোর করে বললেন, 'জয় ভাগাড়ের জয়।'

● এতদিন শুনেছিলাম মানুষেরা অভিশাপ দেয়, তুই মরলে কুকুরে শেয়ালে খাবে। সেদিন দেখি কুকুরেরা ঝগড়া করছে, 'মরবি মরবি, মরলে তোকে মানুষে খাবে।'

● এক ব্রাহ্মণ কাঁধে পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছিল। তিন ঠগ প্ল্যান করে আলাদা আলাদা করে ব্রাহ্মণকে বললেন কুকুর নিয়ে চললেন কোথায়। বেচারা ব্রাহ্মণ পাঁঠায় গোলমাল আছে ভেবে তাকে ছেড়ে দিল। তিন ঠগ সেই পাঁঠা দিয়ে ভোজ লাগাল। ...এই গল্প সবার জানা। এখন যুগ পাল্টেছে। ঠগের বংশধররা আজও ঠকায়। সেদিন পাঁঠাকে কুকুর বলে চালিয়েছিল। এখন কুকুরকে পাঁঠা বলে চালায়।

● কেভিন কার্টারের একটি বিখ্যাত ছবি সবাই দেখেছি। একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশু। তার দিকে লোলুপ চোখে চেয়ে আছে এক শকুন। মৃত্যুর অপেক্ষায়। আলোড়ন ফেলেছিল সে ছবি। আরেকটি ছবি শোরগোল ফেলেছে সারা বিশ্বে। একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত শকুন মৃতপ্রায়। তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এক মানুষ। নামী রেস্তোরাঁর সাপ্লায়ার। শকুন মরলেই তা দিয়ে টার্কির রোস্ট হবে। অনেক দামে বিকোবে মালটা।

● পরিবেশ দপ্তর স্বচ্ছ ভারতের অবদানের পুরস্কার ঘোষণা করতে চলেছে। নাম ঘোষণা হলো কলকাতার দুই মাংস বিক্রেতার। ভাগাড় থেকে এতো পরিমাণ মৃত প্রাণী তারা সাফ করেছে, তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

● এক বিরিয়ানির দোকানে বোর্ড ঝোলানো ছিল 'নো বিফ'। কে যেন তার নিচে লিখে দিয়েছে— ওনলি ডগ, ক্যাট, ফক্স, র‍্যাট।

● এ সবই কাল্পনিক। কিন্তু যে দেশে এসি রেস্তোরাঁয় বসে দামের সঙ্গে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিয়ে ভাগাড়ের মাংস খেতে হয়, সে দেশে সবই বাস্তব।

সংগৃহীত—

উবাচ

"নেপালের মাটি কোনও ভাবেই ভারত-বিরোধী কাজের জন্য ব্যবহার হতে দেওয়া যাবে না।"

কে পি শর্মা ওলি
নেপালের প্রধানমন্ত্রী

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেপাল সফরের সময় বক্তব্য

"শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী এক নয়। আর্থিক কারণে কেউ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে এলে তারা শরণার্থী হতে পারে না।"

তথাগত রায়
ত্রিপুরার রাজ্যপাল

কলকাতা প্রেস ক্লাবে বক্তব্যে

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রাণনাশের অভিযোগ বহুবার করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৮ বার এমন অভিযোগ করেছেন।"

মুকুল রায়
বিজেপি নেতা

মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণনাশের অভিযোগের জবাবে একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে বক্তব্যে

"এবার পঞ্চায়েত ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপির সভাপতি

পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা প্রসঙ্গে

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কোনও সংবিধান সম্মত ব্যবহার আশা করা বৃথা। সে কারণেই আমি পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানাই।"

বাবুল সুপ্রিয়
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসাত্মক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

ভারত ইতিহাসের এক ঘৃণিত চরিত্র জিন্না

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বিতর্কটি শুরু হয়েছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মহম্মদ আলি জিন্নার প্রতিকৃতিটি থাকবে কিনা তা নিয়ে। এখানে স্মরণীয় যে অবিভক্ত ভারতের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের দাবি উঠেছিল। স্বাধীন ভারতেও গত সত্তর বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নার প্রতিকৃতি যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গেই শোভা পাচ্ছে। কিন্তু সত্তর বছর পরে এখন দাবি উঠেছে, জিন্নার প্রতিকৃতি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই দাবিকে কেন্দ্র করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর উত্তেজিতও হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে দেশব্যাপী বিতর্ক। এই বিতর্কের আবহে এই দেশের সেকুলার এবং বামপন্থীরা জিন্নার পক্ষ নিয়ে আসরে নেমেছেন। এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, এই বামপন্থীরাই মুসলিম লিগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দাবি তুলেছিল— আগে পাকিস্তান দিতে হবে, পরে ভারত স্বাধীন হবে। এবার এই বিতর্কে সেকুলার এবং বামপন্থীদের বক্তব্য, ১৯৩৮ সালে জিন্নাকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের আজীবন সাম্মানিক পদ দেওয়া হয়েছিল। এতদ্ ব্যতীত জিন্না ভারত ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। অতএব জিন্নার প্রতিকৃতি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শোভা পাবে। মহম্মদ আলি জিন্না ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র একথা কেউ অস্বীকার করছে না। একথা অস্বীকার করা যায়ও না। কিন্তু ভারত ইতিহাসের কেমন চরিত্র জিন্না? লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য সেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো স্মরণীয় এবং বরণীয় চরিত্র কি? নাকি ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরি, তৈমুর লং, আলাউদ্দিন খিলজির যে স্থানটি রয়েছে, সেই ঘৃণা এবং অসম্মানের স্থানেই অবস্থান করছেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক কয়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলি জিন্না? জিন্নার প্রতিকৃতি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে কি থাকবে না— এ বিচার করতে বসলে প্রথমেই ইতিহাসের আলোয় জিন্না চরিত্রটিকে দেখে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, মহম্মদ আলি জিন্না অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রটিকে ভাগ করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান আদায় করতে। জিন্নার ভারত ভাগ করার এই প্রচেষ্টার পিছনে ব্রিটিশদেরও সায় ছিল। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ ভারত ভাগ করে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি তোলে। স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি এনেছিলেন উর্দু কবি ইকবাল। বলতে গেলে, চল্লিশের দশকের সেই গোড়া থেকেই জিন্নার উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িক রূপটি প্রকাশ পেতে শুরু করে। ওই সময় থেকেই মুসলমান গরিষ্ঠ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর হামলাও শুরু হয়। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, বালুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি মুসলিম লিগ। জিন্না বুঝেছিলেন, কোনও গণতান্ত্রিক পন্থায় তিনি তাঁর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি আদায় করতে পারবেন না। এটা বুঝতে পেরেই জিন্না সরাসরি সংঘর্ষের, অর্থাৎ সন্ত্রাসের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথ ধরলেন। ১৯৪৬ সালের ২৭-২৯ জুলাই মুম্বাইয়ে মুসলিম লিগের সর্বভারতীয় সভায় জিন্না 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা বললেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলতে কী বোঝান জিন্না? জিন্না পরিষ্কার বললেন, 'আমার হাতে একটা রিভলবার আছে, এবং আমি জানি তা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।' বললেন, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনের দিন আমি কোনও নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছি না।' জিন্নার দুই অনুগামী, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং লিয়াকত আলি খান বললেন, 'আমরা অহিংসায় বিশ্বাস করি না। ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলতে বোঝায় আইন ভেঙে যে-কোনও কাজ করা।' তাঁরা যে সন্ত্রাসের পথেই পা বাড়াচ্ছেন, জিন্না এবং তাঁর শাকরেদরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জন্য জিন্না বেছে নিয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতাকে। কলকাতাকে বেছে নেওয়ার পিছনেও জিন্নার একটি হিসাব ছিল। অবিভক্ত বাংলায় তখন শহিদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ সরকার। কলকাতা শহরের মুসলমান

কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসকে সম্বল করে যিনি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন— গত সত্তর বছর ধরে তাঁরই প্রতিকৃতি যদি শোভা পেয়ে থাকে এদেশের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে— তবে নিশ্চিত ভাবে তা আমাদেরই ভুল। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই আজ জিন্নার প্রতিকৃতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণ করেন সোহরাওয়ার্দি। ১৯৩৬ সালে কলকাতা শহরে একটি দাঙ্গা সংঘটিত করার অভিজ্ঞতাও সোহরাওয়ার্দির রয়েছে। জিন্না বুঝেছিলেন, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে কলকাতায় যদি মুসলিম লিগ তাণ্ডব শুরু করে, তাহলে সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ সরকার চোখ বুজে থাকবে।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট, শুক্রবার। সেদিন জুম্মার নমাজের পর কলকাতা শহরে সশস্ত্র মুসলমান দাঙ্গাবাজরা হানা দিল হিন্দু এবং শিখ এলাকাগুলিতে। টানা তিনদিন ধরে চলল নারকীয় হত্যাকাণ্ড। সরকারি হিসাবে এই তিনদিনে পাঁচ হাজার হিন্দু এবং শিখ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করেছিল জিন্নার বাহিনী। সোহরাওয়ার্দি পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। লিওনার্ড মোসলে তাঁর 'লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশ রাজ' গ্রন্থে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে লিখেছিলেন— 'চৌরঙ্গির রাস্তায় লাশের পাহাড় জমেছে। আর সেই লাশ ছিঁড়ে খাচ্ছে শকুন।' আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কলকাতা শহরে নারী-পুরুষ নির্বিচারে খুন হচ্ছে, আর পুলিশ-মিলিটারি নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।' লর্ড ওয়াভেল বলেছিলেন, 'পলাশীর যুদ্ধে যত লোক মারা গিয়েছিল, তার থেকে বেশি লোক মারা গিয়েছিল এই তিনদিনে কলকাতা শহরে'। লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধীকে বলেছিলেন--- 'মনে রাখবেন, জিন্না কেবলমাত্র মহড়া হিসাবে কলকাতা শহরে পাঁচ হাজার লোককে খুন করিয়েছেন এবং পনেরো হাজার লোককে আহত করেছেন। এরপর জিন্নার দাবি না মানলে তিনি গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ছাড়বেন।' তিনদিন ধরে এই নারকীয় হত্যালীলা চলার পরে হিন্দু এবং শিখেরা রুখে দাঁড়ানোয় মুসলিম লিগের গুণ্ডাবাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস হিসাবে আজও বর্ণিত হয়ে আসছে।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে মুসলিম লিগ নেতা গোলাম সরওয়ারের নেতৃত্বে শুরু হলো হিন্দু নিধন। কয়েকদিনের মধ্যেই, সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৩ হাজার হিন্দু-পুরুষ রমণীকে হত্যা করা হলো। বহু হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করা হলো, অপহৃতা হলেন বহু হিন্দু রমণী। যে হিন্দু পরিবারগুলি জলপথে পালাবার চেষ্টা করেছিল, মাঝনদীতে তাদের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হলো। এই নারকীয়তার সংবাদে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল। সুচেতা কৃপালনীর মতো ব্যক্তিত্ব ছুটে গেলেন নোয়াখালিতে, আক্রান্তদের পাশে। গোলাম সরওয়ার ঘোষণা করলেন, সুচেতা কৃপালনীকে ধরতে পারলে মুসলিম লিগ কর্মীরা যেন তাঁকে ধর্ষণ করেন।

জিন্নার এই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে উগ্র সাম্প্রদায়িক জিহাদের প্রমাণ পাওয়া যায় সে সময় মুসলিম লিগের প্রচার-পত্রগুলিতেও। একটি প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল, 'এমন এক রমজান মাসেই বদরের যুদ্ধ হয়েছিল। এটিই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ। মুসলিম লিগের সৌভাগ্য যে এমন একটি পবিত্র মাসেই তারা ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করেছে।' তরবারি হাতে জিন্নার ছবি দেওয়া আর একটি প্রচারপত্রে লেখা ছিল— 'হে কাফেরগণ, সুখ বা গর্ব অনুভব কোর না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারির দ্বারা জয়ের বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।'

শুধু অবিভক্ত বাংলা নয়। পঞ্জাব প্রদেশও জিন্নার এই নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। দেশবিভাগের লগ্নে অবিভক্ত পঞ্জাবে হিন্দু এবং শিখদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জিন্নার সৃষ্টি 'মুসলিম গার্ড'। পঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর জেনকিন্স এই মুসলিম গার্ডকে হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মোসলে তাঁর গ্রন্থে এই মুসলিম গার্ডের নৃশংসতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ছোটো ছোটো শিশুদের দেওয়ালে আছাড় মেরে হত্যা করা হয়েছিল। বালিকাদের ধর্ষণ করার পর তাদের পা চিরে হত্যা করা হয়েছিল। হিন্দু এবং শিখ রমণীদের ধর্ষণের পর স্তন কেটে নেওয়া হয়েছিল। গর্ভবতী রমণীদের পেট চিড়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করা হতো। মোসলের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী জিন্নার রক্তের তৃষ্ণা নিবারণ করতে দেশভাগ লগ্নে এক লক্ষ পুরুষ-রমণীকে হত্যা করা হয়েছিল।

এই হচ্ছেন মহম্মদ আলি জিন্না। লক্ষাধিক মানুষের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে— এহেন জিন্নার প্রতিকৃতি কেন স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সাজিয়ে রাখব? বিশ্বের ইতিহাসে নরহত্যাকারী হিটলার, মুসোলিনি, স্তালিনের পাশেই তো জিন্নার স্থান। আজ যারা জিন্নার প্রতিকৃতি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাজিয়ে রাখার দাবিতে আন্দোলন করছেন— তারা প্রকৃত অর্থেই অসম্মান করছেন নিজের পিতৃপুরুষকে। পিতৃপুরুষের অশ্রুজল, বেদনাকে অসম্মান করছেন তারা। কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসকে সম্বল করে যিনি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন— গত সত্তর বছর ধরে তাঁরই প্রতিকৃতি যদি শোভা পেয়ে থাকে এদেশের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে— তবে নিশ্চিত ভাবে তা আমাদেরই ভুল। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই আজ জিন্নার প্রতিকৃতি সরিয়ে ফেলতে হবে। ভারত ইতিহাসের ঘৃণিত এই চরিত্রের প্রতিকৃতি, শুধু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কেন, ভারতের কোথাওই স্থান পেতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশও জিন্নাকে বিদায় জানিয়েছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব রাস্তা জিন্নার নামে ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে সেসব রাস্তার নাম পালটানো হয়েছে। ভারতকে যারা এখনও টুকরো করতে চায়, তারা জিন্নার প্রতিকৃতিতে ফুলমালা চড়িয়ে পুজো করতে পারে। কিন্তু আপামর ভারতবাসী জিন্নাকে শুধু ঘৃণাই করবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জল আর ঘৃণাকে সম্বল করেই কয়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলি জিন্না থেকে যাবেন ভারত ইতিহাসের পাতায়। ■

জিন্নার মামদো ভূত ভারতে চাকু নাড়ছে

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে মহম্মদ আলি জিন্না বেশ বর্ণময় চরিত্র। সম্প্রতি তাঁর কথা উঠে এসেছে একটি বিতর্ককে ঘিরে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তারিক মনসুরকে একটি চিঠি লেখেন স্থানীয় সাংসদ। তাঁর প্রশ্ন ছিল, আ. মু. চত্বরের কোথাও মহম্মদ আলি জিন্নার ছবি আছে কিনা। অধ্যাপক মনসুর তাঁর চিঠির জবাব দেননি। কিছুদিন পর আবার চিঠি লেখেন ওই সাংসদ। এবার আ. মু.-র ছাত্রসংসদের সম্পাদক জানান হ্যাঁ, তাদের ছাত্রসংসদ দপ্তরে মহম্মদ আলি জিন্নার ছবি সংরক্ষিত আছে। এর কারণ ১৯২০-তে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রথম কোর্ট-এর সদস্য ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। ১৯৩৮-এর ছাত্রসংসদের আজীবন সদস্য হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করা হয়। অতএব তাঁর ছবি তাদের দপ্তরে থাকার মধ্যে কোনও বিতর্ক নেই।

আমাদের মনে পড়তে পারে, এই ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে গত বৎসর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়। বলা হয়, যেহেতু একদা রাষ্ট্রপতি মহাশয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অর্থানুকূল্যে চলা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের এইরকম ঘোষণা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কারণ পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিদর্শক'। এই দুঃসাহসের পাশাপাশি জিন্নার ছবি রাখার পক্ষে যুক্তি দেখানো আরেক প্রস্থ দুঃসাহসই বলতে হবে। দেশের খেয়ে পরে, দেশের প্রথম নাগরিককে অশ্রদ্ধা আর দেশ ভেঙে টুকরো করে রক্তপাত ঘটিয়ে অন্য একটি দেশ গড়েছিলেন যিনি তাঁর ছবি টাঙিয়ে রাখার পিছনে যুক্তি খোঁজা— দেশদ্রোহী বিকৃত মানসিকতার পরিচয় ছাড়া কিই বা বলা যায়?

মহম্মদ আলি জিন্না (২৫.১২.১৮৭৩— ১১.৯.১৯৪৮) পাকিস্তানের স্রষ্টা--- ১৯৪৭-এ তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হন। একথা ঠিক, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রথম দিকে কিছু ভূমিকা নিয়েছেন, যা সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। তবে সেইসব আধুনিক অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা তো তাঁর রাজনীতির প্রধান কাজ বলে

জিন্নার সমর্থনে আলিগড়ে বিক্ষোভ।

গণ্য করা যায় না। একথা মানতেই হবে মহম্মদ আলি জিন্না দেশ ভেঙেছেন— ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি খলনায়ক ছাড়া কিছু নন। একটি তির চাকচিক্যময় শিল্পমণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু সেটি যখন কাউকে আঘাত করে— রক্তপাত হয়, আহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়— তখন তিরটির শিল্প নিয়ে চর্চা করা মিথ্যাচার, মতলবি কুরুচি ছাড়া কিছু নয়। ভারত জোড়া বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষপাতীরা জিন্নার জীবনের শেষ চোদ্দ মাসকে বাদ রেখে বিচিত্র মত প্রকাশ করে চলেছেন। কিন্তু এই শেষ চোদ্দ মাসই তো ভারতমাতাকে তীক্ষ্ণতম বাণে বিদ্ধ করেছে! ধর্মনিরপেক্ষতার এইসব সারবান প্রবক্তারা মুসলমান তোষণ ছাড়া কিছু বোঝেন না। তারা হয়তো ভাবেন, ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ণ শর্ত হলো মুসলমানদের তোষণ করা। অথচ মুসলমানরা কি এজন্য বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা দেখায়? দেখালে রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে এই ঘৃণ্য অপমানজনক আক্রমণাত্মক সমালোচনা তারা করত না।

মহম্মদ আলি জিন্নার পরিবার মাত্র এক প্রজন্ম আগেই মুসলমান হয়েছেন। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন প্রেমভাই মেঘিজি ঠাক্কর। তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল মাছ ব্যবসা। গুজরাটের বৈশ্য সমাজ তখন তাঁদের পরিবারকে নানাভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। হিন্দু সমাজের নানারকম নেতিবাচক দিক আছে; যতদিন গেছে এইসব দূর করা হয়েছে। সে যাই হোক, জিন্নার পিতা এই অন্যায় ব্যবস্থার বিপক্ষে প্রতিবাদ করে ইসলাম কবুল করেন। পাঞ্চুলাল ঠাক্কর হন পুঞ্জাভাই জিন্না। ইনি মহম্মদ আলি জিন্নার পিতা। জিন্না জন্মেছিলেন করাচিতে। তীক্ষ্ণধী আইন ব্যবসায়ী জিন্না ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নিয়ম পালন করতেন না। জীবনে কখনো নমাজ পড়েননি। কেউ কেউ বলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির অনুরোধে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একবার তিনি নমাজ পড়তে যান। জিন্না নাকি বলেন, তিনি তো এইসব কিছু জানেন না! লিয়াকত আলি তাঁকে বলেছেন, সবাই যেমন যেমন করবেন, তিনি তাঁর অনুকরণ করলেই হবে! মদ্যপান করতেন, খেতেন শুয়োরের মাংস। এজন্য গোঁড়া মুসলমানরা তাঁকে কোনওদিন 'ভালো ভাবে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তান হবার পর তাঁর পোষা কুকুর দুটির সঙ্গে জিন্নার কোনও ছবি রক্ষিত হয়নি! আসলে কুকুর নাকি ধর্মাচরণের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ! এই কারণেই ওই পোষা

কুকুর সম্পর্কে আপত্তি? হতে পারে। একদা জিন্না অহঙ্কার করে বলেছেন, পাকিস্তান তাঁর টাইপ-রাইটার থেকে জন্ম নিয়েছে! পাকিস্তান হবার পর তিনি প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন, পাকিস্তান হবে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাষ্ট্র। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করার কেউ ছিল না। পাকিস্তান অচিরেই হয়ে পড়েছে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ রাষ্ট্র। শোনা যায়, মহম্মদ আলি জিন্না নাকি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে বলেছেন, তাঁর জীবনের প্রধান ভুল— পাকিস্তান গড়া। বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক যুক্তিবাদী কিন্তু প্রবল অভিমানী আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রী জিন্নার জীবনে এই রকম ট্রাজেডি অনিবার্য ছিল।

আলিগড় বিতর্কের পর ভারতের অত্যুৎসাহী ধর্মনিরপেক্ষতার মেকি সমর্থকরা বলেছেন, জিন্নাকে পাকিস্তানের জন্য দায়ী করা যায় না। এ ব্যাপারে আসল দায় নাকি বীর সাভারকার বা অন্য কিছু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনায়কের! ইতিহাসের এমন বিকৃত পাঠের কোনও অর্থ হয় না। প্রথম জীবনে জিন্না ব্যারিস্টার হিসাবে বেশ কিছু কেস লড়েছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হয়ে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। প্লেগ-এর তীব্র মহামারী প্রতিরোধে ব্রিটিশ রাজ ঠিক মতো ভূমিকা না নেওয়ায় তীক্ষ্ণ সমালোচনা সরকারের রাজদ্রোহ মনে হয়। বিচারে তিলককে ১৮ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯০৮-এ ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকিদের পক্ষে জ্বালাময়ী রচনার জন্য আবার ব্রিটিশরাজ তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ করে। এবার অপরাধ প্রমাণ হলে ছ' বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ১৯১৬ সালে তিলকের পক্ষে মামলা লড়েন জিন্না। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায় তিলক বেকসুর প্রমাণিত হন। ১৯২৯-এ আইন সভার সদস্য হিসাবে বিপ্লবী ভগৎ সিংহের পক্ষে জিন্নার বক্তৃতা বিখ্যাত হয়। বিশেষত বিপ্লবী বন্দিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের দাবি তোলেন তিনি। সে দাবি মেনে নেয় সরকার।

১৯১৫ নাগাদ গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বোম্বে বন্দরে নামলে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মহম্মদ আলি জিন্নাকে সবাই কারবার 'মুসলমান ভদ্রলোক' বলে সম্বোধন করেন— অথচ তখন সেই সভার তিনি সভাপতি! এতে জিন্নার অভিমান হয়। ক্রমে তিনি অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৩৬ সাল থেকে তিনি মুসলিম লিগের সদস্য হন। ১৯৪০ থেকে লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান-প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লিগকে তিনি ভারত ভাঙার জন্য সর্বাঙ্গীণ অন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে গড়ে তোলেন।

এই অবস্থায় আমরা কোন জিন্নাকে স্মরণ করব? যে জিন্না আধুনিক গণতন্ত্রকামীর ছদ্মবেশে মুসলমানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন, তাঁকে কিছুতেই মোছা যায় না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ১৯২৮ মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সভায় জিন্না প্রস্তাব দেন আইন সভায় হিন্দু-মুসলমানের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব চাই। তিলক-জিন্নার মধ্যে স্বাক্ষরিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ১৪-দফা কর্মসূচি গৃহীত হয় ১৯১৬ সালে। লখনউ শহরের সেই চুক্তির বিধি সম্পূর্ণ হিন্দু-বিরোধী পদক্ষেপ হিসাবে সুকৌশলে প্রয়োগ করলেন একযুগ পরে— তখন ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র সিকিভাগ ছিল মুসলমান! জিন্না চেয়েছেন চাপ সৃষ্টি করতে। এই সময় থেকে তিনি হিন্দু সমাজকে ভাঙার কাজটি সুচারুভাবে করতে লেগেছেন।

অন্তবর্তী সরকারে অল ইন্ডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে গোপনে তিনি প্রস্তাব পাঠান তাঁকে মুসলিম লিগ আইন ও শ্রম দপ্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী করতে চায়। এর ফল ভয়ঙ্কর হয়েছে। যোগেনবাবু মন্ত্রী হলেন, কিন্তু তাঁকে দেশ বিভাগ সমর্থন করতে হলো। শ্রীহট্টের গণভোটে নমঃশূদ্র-সহ পশ্চাদপদ সমাজকে ভুল বুঝিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে তিনি প্রচারে নামলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সমান্তরালে তিনি 'অখণ্ড বঙ্গ' গড়ার চেষ্টা করলেন। এ কাজে অবশ্য তিনি নেতাজী সুভাষের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে সামনে রাখতে পেরেছিলেন। পিছনে ছিল মুসলিম লিগ।

১৯৩৯-এর ২২ ডিসেম্বর ভারতীয় উপমহাদেশের সাতটি প্রদেশের মন্ত্রীসভা থেকে কংগ্রেসী সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন। মহম্মদ আলি জিন্না এইদিন সারা দেশে 'মুক্তি দিবস' পালন করার ডাক দেন। এভাবে ধীর কিন্তু নিশ্চিত উপায়ে এদেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের সেঁকো বিষ ঢুকিয়েছেন যিনি তাঁর জীবনের একটি পর্ব আলাদা করে ধরে নিয়ে জিন্নার নামে ঢাক পেটালে ইতিহাস টুকরো করে নেওয়া হয়। আর এই ইচ্ছাকৃত টুকরো ইতিহাসে যা রচনা করা হয় তা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। আলিগড়ের দেওবন্দি তালিবানি মানসিকতায় লালিত ছাত্ররা একাজ করুক তাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক সাংবাদিকরা তড়পাতে শুরু করলে সন্দেহ হয় এরা যদি পেড-সাংবাদিক না হন তাহলে কথাটির অর্থ তাৎপর্যই থাকে না।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেখা করে এসেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, জিন্নার ছবি ভারতে বেশ কিছু জায়গায় আছে। মুম্বই হাইকোর্ট, সাবরমতী গান্ধী আশ্রম, নেহরু মিউজিয়ামেও মহম্মদ আলি জিন্নার ছবি আছে। একথা শোনার পরই অত্যুৎসাহী কিছু প্রবীণ সাংবাদিক আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন। আমরা এতে বিস্মিত নই। ভারতে বহু মানুষের হৃদয় রাজ্যে মুসলমানের প্রতি দাসত্বের বিষ কাজ করে যায় বটে। তা না হলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, জে. এন. ইউ.-এর ছাত্রদের জিন্নাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়ার জন্য দল পাকাতে দেখা যেত না। এরা দেশে ছোটো ছোটো অঞ্চলে আজাদি চায়। তাই 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি তোলা মহম্মদ আলি জিন্না তাদের হৃদয় সম্রাট হলেও হতে পারেন।

কিন্তু আমরা কী করে ভুলব ১৯৪৬-এর আগস্টের 'ডিরেক্ট অ্যাকশান ডে'-র কথা? কলকাতার লক্ষ হিন্দুর জীবন, নারীর সম্ভ্রম মুছে দেবার গুণ্ডামি— যার উৎসে ছিলেন এই ভণ্ড কৌশলী আত্মবিরোধী নেতা। নোয়াখালির দাঙ্গা— দাঙ্গাই বা বলি কেন এক তরফা হত্যাকাণ্ড— ভুলে গিয়ে, একের পর এক দাঙ্গা থেকে বাঁচতে সীমান্ত পার হয়েই যারা জিন্নার ভজনা শুরু করছেন, তাদের কৌশল আর মেরুদণ্ডহীনতাকে কোনও ভাষাতেই ধিক্কার জানানো সম্ভব নয়। জিন্নার মামদো ভূত ভারতে চাকু নাড়ছে— হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ না করে উপায় নেই। যুদ্ধটিতে আমাদের জিততে হলে দেশ বিরোধী এই পঞ্চম বাহিনীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই হবে। ■

বামৈস্লামিক — বামপন্থার নব্য রূপ

স্বনাম গুপ্ত

বামপন্থীদের সঙ্গে দীর্ঘ বন্ধুত্বের সুবাদে মনে প্রশ্ন জাগে, ধর্মহীন হয়েও কীভাবে ওরা প্রত্যেক স্লোগানের শেষে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বলে? কীভাবে বিশ্বত্রাস লাদেন 'কমরেড লাদেন' হয়? কীভাবে অসংখ্য হিন্দু হত্যাকারী এবং ধর্ষণকারী হিন্দু বিদ্বেষী জেহাদি তিতুমির, টিপু সুলতানরা এদের কাছে মহান দেশপ্রেমী স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়। তাদের মতে যদিও তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষই হয়নি। প্রগতিশীল হিসেবে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির সমালোচনা করলেও কেন ইসলামিক বর্বরতা নিয়ে লেখে না, কেন নারীবাদী প্রগতিবাদী হয়ে মনু সংহিতার বিরোধিতা করলেও শরিয়ত নিয়ে কিছু বলে না? কেন হিন্দু সন্ত্রাসবাদ থাকলেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নেই? এরকম হাজারো প্রশ্ন। এখন আর প্রশ্ন জাগে না। আগে ভাবতাম এসবই নিছক ভোটের তোষণ, এখন দেখছি গভীর গোপন সম্পর্ক, ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার, এই 'দার-উল হাবর'-কে 'দার-উল ইসলাম'-এ উত্তরণের এক সুপরিকল্পিত যৌথ পরিকল্পনা!

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, বামপন্থীদের এই দ্বিচারিতার মুখোশটা খুলতে গেলেই বামপন্থী এবং বামপন্থী সাজা মুসলমানরা একযোগে এক সুরে আপনাকে আক্রমণ করবে। দেখা যায়, মুসলমানরা বামপন্থীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রগতিশীল সেজে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গোঁড়ামি নিয়ে, হিন্দু ধর্ম নিয়ে বেশ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে। হঠাৎ করে মনে হবে যেন এরা সত্যিই প্রগতিশীল নাস্তিক। কিন্তু এরা কখনো ইসলামের সমালোচনা করে না, হিন্দু পদবীধারী নাস্তিক বামপন্থীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মনু সংহিতার বিরুদ্ধে বললেও নিজেদের মধ্যযুগীয় শরিয়ত নিয়ে কিছু বলে না। এদের চেনার সহজ উপায় হলো ইসলামের সমালোচনা করা। করলেই দেখা যাবে, বামপন্থার মুখোশটা খুলে ফেলে দিব্যি ধর্মভীরু পাক্কা মুমিনের ভূমিকা নিয়ে এরা একযোগে ইসলামের পক্ষে নেমে পড়েছে।

কথা সেটাও নয়, হয়তো হিন্দু সেকুলারিজম আর মুসলিম সেকুলারিজমের মাপকাঠিটা আলাদা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হিন্দু পদবিধারী বামপন্থীদের কি এদের এই বিসদৃশ আচরণগুলি নজরে আসে না? আসে, আসলে বামপন্থীদের সঙ্গে ইসলামিস্টদের বেশ গভীর সম্পর্ক। বামপন্থীরাই ইসলামপন্থীদের বামপন্থী বা সেকুলার সেজে এদের সঙ্গে মিশে থাকার সুযোগ করে দেয়। কারণ বামপন্থীরাও দেশবিরোধী। বামপন্থীরা সব দেখেও এদের কমরেড বলে সম্বোধন করে। কারণ বামপন্থীরা তো আসলে ইসলামেরই গর্ভস্রাব। সেই কারণেই এত হিন্দু বিদ্বেষী! কমিউনিস্টরা আসলে মোটেও ধর্মবিরোধী নয়, হিন্দু বিরোধী। ওদের 'জেহাদ'ই এদের শ্রেণী সংগ্রাম, ওদের 'কাফের'ই এদের শ্রেণীশত্রু, ওদের 'ইনশাল্লাহ'ই এদের ইনকিলাব। এরা স্বপ্ন দেখে এভাবেই বামপন্থীদের কাঁধে ভর দিয়ে সারা বিশ্বে একদিন ইসলাম কায়েম হবে, থুড়ি ইসলামের রক্ত পিচ্ছিল পথেই সারা বিশ্বে বামপন্থী, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। ঠিক যেভাবে আফগানিস্তানে ১৯৯০ সালে, ইরানে ১৯৭৯ সালে এবং ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৫৯ সালে মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পর বামপন্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইনশাক্লাব, ইনশাল্লেলিন!

দেখুন, কেমন গোড়াতেই গলদ। বামপন্থীরা ধর্ম মানে না। মানুষের জীবনে ধর্মের কোনো প্রভাব বা গুরুত্ব নেই। অথচ হিন্দু পদবীধারী বামপন্থী আর মুসলিম পদবীধারী বামপন্থীদের মধ্যে কত পার্থক্য।

ইসলামে গভীরভাবে বিশ্বাসী একজন খাঁটি ধর্মপ্রাণ মুমিন কী করে একজন বামপন্থী হতে পারে বা একজন ধর্মহীন বামপন্থী কীভাবে একজন ধর্মপ্রাণ মুমিন হতে পারে? JNUSU-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং AISA-র শেহলা রাশিদের গনিমতের মাল, বিধর্মী নারীদের যৌনদাসী হিসেবে বাজারে গোরু-ছাগলের মতো বিক্রি করতে বলা বা তিন তালাক, নিকাহ্, হলালা বহু বিবাহের মতো নারী স্বাধীনতা হরণকারী মহম্মদের গুণকীর্তণ করা বক্তব্য শোনেননি? মহম্মদকে মানলে তো মহম্মদের বলা জিব্রাইল, ফেরেস্তা, জন্নত, হুর, মিরাজ গমন, অসংখ্য গল্পগাছা সবই মানতে হয়। আর বিধর্মীদের প্রতি অমানবিক নিষ্ঠুর নির্দেশগুলি?

আসুন শুনি—

On January 25, 2013, Shehla Rashid wrote,

Prophet Muhammed (PBUH) was a feminist and feminism is Sunnah Here's wishing all Muslims a blessed 12th Rabbi-ul-Awwal the birth date of the holy Prophet of Inlam, Muhammed (Peace be Upon Him). Although there exists a lot of debate around whether this day ahould be commemorated or not, there's no second opinion on the fact that his birth was a blessing for the

বলশেভিক আন্দোলনে মুসলমানরা।

entire bumanity.

Translation : The truth about God would heve remained shrouded in mystery if it weren't for the holy Prophet (SAW) who released humanity from the clutches of ignorance. The Prophet (SAW) fought for the emancipation of women in a time and place where girl children were buried alive, not allowed to make any choices, not allowed to hold property. In an era when there were numerous war widows, practically withour any rights, he (SAW) took the hand of some of them (RAA) in marriage, while making sure that he (SAW) is not biased towards or against any one or few of them (RAA).

Dear Muslim men and women and all people reading this post, let's resolve to make the world a place where women can lead their lives with dignity and make choices on their own. Let's he progressive rather than regressive. Had Muhammed (SAW) not fought against female infanticide I may not be even alive and writing this post right now. He (SAW) was a feminist, in my Humble opinion, and thus, feminism should be Sunnah. Feninism need not be advocacy of short skirts. It's about equality of rights as humans who are capable of experiencing the same emotions-pain, love, joy and freedom. We will never realy progress untill we treat our women better.

Eid-e-Milad-un-Nabi (SWA) Mubarak !

এবার বলুন, এই মূল্যায়নটা কি উনি একজন বামপন্থী হিসেবে করেছেন, নাকি এই বক্তব্য সেই সত্যটাকেই প্রমাণ করছে যে, যত শিক্ষিতই হোক, প্রগতিশীল হোক, কোনও মুসলমানই ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বটা এরা ছাড়তে পারে না? এরা বামপন্থী সেজে বামপন্থীদের সঙ্গে মিশে বামপন্থীদের ব্যবহার করে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে?

তাহলে বোঝা গেল, ইসলামপন্থী হয়েও বামপন্থীদের ব্যবহার করে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে।

তাহলে বোঝা গেল, ইসলামপন্থী হয়েও বামপন্থী হওয়া যায় বা বামপন্থী হয়েও ইসলামপন্থী। কমিউনিস্টরা ধর্ম মানি না বললেও ইসলাম বা মহম্মদের প্রতি এদের রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা। এটা নিছক রাজনীতি বা ভোটের অঙ্কে নয়, এই শ্রদ্ধাটা আসে এদের অন্তর স্থল থেকেই। কমিউনিজম মুসলমানদের নাস্তিক বানায় না, শুধু হিন্দুদের ধর্ম ভুলিয়ে দেয়, যাতে এদের অতি কাঙ্ক্ষিত ইসলামিক আগ্রাসনটা বিনা বাধায় হতে পারে। আসলে এই বামপন্থা হলো ইসলামাইজড বামপন্থা।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, এদের সব প্রতিক্রিয়াই একটি সম্প্রদায়ের দিকে চেয়ে থাকে। এদের সব চাওয়াই একটি সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। বামপন্থীদের বামপন্থার সমালোচনা করলে যতটুকু না রাগ হয়, এর চেয়ে বেশি রাগ হয় ইসলাম নিয়ে কিছু বললে।

নিজেরা তো বলবেই না, কিন্তু কেউ ইসলামিক বর্বরতা বা জেহাদি মুসলমানদের দুষ্কর্মগুলির দিকে আঙুল তুললেই অযৌক্তিক অপ্রাসঙ্গিক নানা হাস্যকর সব যুক্তি দিয়ে এগুলি ঢেকে রাখাই বামপন্থীদের একমাত্র কাজ। গীতা হোক আর গুড়িয়া বা ভাগাড়ের মাংস, ধুলাগড়, বাদুড়িয়া হোক বা আন্তর্জাতিক ইসলামিক বর্বরতা --- ইসলামের দিকে আঙুল তুললেই বামপন্থীরা বর্ম হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তুতুভাইদের সামনে। আসলে বামপন্থা তো ইসলামেরই গর্ভস্রাব, এরপর সেই ইসলামের গর্ভেই বিলীন হয়ে যাওয়াই এদের মোক্ষ।

আসুন রহস্যটা কি দেখি--

Muslim people will unite themselves to communism : like comunism, Islam rejects narrow nationalism." [The Bolsheviks and Islam part-3 : Islamic communism]

বা,

Gerry Byme তাঁর The Bolsheviks and Islam part-3 : Islamic communism শীর্ষক আলোচনায় এ বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

"All Muslim colonised peoples are proletarian peoples and as almost all classes in Muslim society have been oppressed by the colonialists, all classes have the right to be called 'proletarians'...Therefore it is legitimate to say that the national liberation movement in Muslim countries has the character of a socialist revolution."

এবার আসুন এঁদের দেখি--

১ম ছবি— কমরেড ফরহাদের মাজারে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা মরহুমের মাগফেরাত কামনা করে আল্লার দরবারে মোনাজাত করছে। একজনের বুকে জ্বলজ্বল করছে চে'র ছবি।

২য় ছবি--- বাংলাদেশের বাম আন্দোলনের দুই শীর্ষ নেতা রাশেদ খান মেনন আর হাসানুল হক ইনুর ২০১৪ সালে হত যাত্রার ছবি, হজের পোশাকে।

৩য় ছবি--- কমিউনস্ট পার্টি অব বাংলাদেশের সদর দপ্তরের ভেতরে নমাজের সুব্যবস্থা।

আসলে বামপন্থীদের কাছে ধর্ম আফিম নয়, শুধু হিন্দুধর্ম আফিম। বলুন তো পাঁচ ওয়ক্ত নমাজ পড়া মুজফ্ফর আহমেদ বহা মৌলানা ভাসানিদের কাছে নিজের ধর্ম কি আফিম ছিল? পলে পলে, মনে প্রাণে শিখ ধর্ম পালন করা হরকিষেণজির পার্টির শীর্ষ পদ পেতে কি ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

যদি ভাবেন, শুধু মুসলমান বামপন্থীরাই ইসলাম বিশ্বাসী এবং হিন্দু পদবীধারী খাঁটি বামপন্থীরা ওই মাপকাঠির পার্থক্যের জন্য এদের ছাড় দিয়ে রেখেছ, তাহলে ভুল করবেন। হিন্দু পদবীধারী বামপন্থীরাও গভীর ভাবে ইসলামে বিশ্বাসী, মহান মহম্মদের মহত্ত্বে বিশ্বাসী। আর ইসলাম বিশ্বাসী বলেই হিন্দু বিদ্বেষী। শুধুই কী রক্তঋণ, নাকি পেট্রোডলার বা ইয়েন? এটাই বামপন্থা, ইসলামাইজড বামপন্থা!

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার-- অনির্বাণ দাশগুপ্ত)

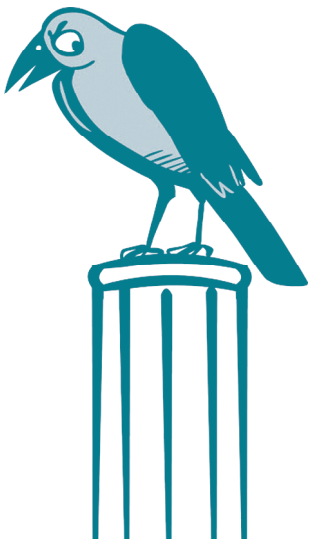

আমরা নূতন যৌবনের ভূত

হঠাৎ সেদিন রেলের কামরায় রবীন্দ্র সংগীতের মহিমা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। সেটি রবীন্দ্রপক্ষের আগমনীতে চলমান নবনৃত্যনাট্য কিনা বোঝা গেল না। কবিগুরু বলতে অজ্ঞান, গৌড়জন এখন শুধু পথে পথে নয়, ট্রেনে-বাসে-নৌকায় চলমান রবীন্দ্রোৎসবে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এবারেই বোধ হয় মেট্রোরেলের কামরায় প্রথম সেটির এক জীবন্ত মহড়া প্রত্যক্ষ হলো। প্রেমোন্মত্ত এক প্রগতিশীল যুগল হটাৎ যেন অঙ্গভঙ্গিতে সরব হয়ে উঠল -- 'মিলন পিয়াসী মোরা'।

কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, ট্রেনের জনকোলাহলে স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রেমের প্রকাশ,প্রতিক্রিয়াশীলতার চক্রে পড়ে শেষে এক করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয়। যদিও একথা সকলের জানা যে, আদি কবির আদি কবিতার জন্ম সেই আদিরসের প্রকোপে, কামোন্মত্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের শরবিদ্ধ হওয়ার বেদনার্ত করুণায়। উন্মুক্ত পরিবেশে মিথুনলীলার ফলে যে শরাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা, সেকথা খেয়াল থাকে না। এমনকী মহাভারতের পাণ্ডুরাজাও উন্মুক্ত বন্য পরিবেশে হরিণ মিথুনের সোহাগ সংগতি দেখে নিজেকে সংবরণ করতে না পারার ফলেই রাজ্ঞী মাদ্রী-সহ মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন। নির্জনে প্রলোভিত হওয়ার ফল যদি এমন মারাত্মক হয়, তাহলে জনতা কোলাহলে সেটির ফল বঞ্চিতের নিত্য ক্ষোভে কী মারাত্মক হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের মতো মান্ধাতা রক্ষণশীল সমাজের অনড় ব্যবস্থার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, কিন্তু পাশ্চাত্যের মুক্ত আবহাওয়াতেও তা যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তা পশ্চিমি সিনেমায় সুপ্রত্যক্ষ। 'ব্লো হট ব্লো কোল্ড' নামে একটি ছবি এখানে নিউ এম্পায়ার সিনেমায় দীর্ঘদিন ধরে প্রদর্শিত হয়। সেখানে পর্যটকদের স্বর্গ এক দ্বীপে প্রেমিকযুগলের বালুকাবেলায় রতির আরতি সন্দর্শন করে এক কাম-বুভুক্ষু নিষ্ফল আক্রোশে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর ফেলে অলস শয়নে শায়িত প্রেমিক পুরুষটির মাথাটি থেঁতলে দেয়। তা সেই রহস্য উদঘাটন নিয়েই ছবিটি। আরও একটি স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ছবিতে দেখি, এক প্রেমিকযুগল গ্রামের অভিসারে একটি বড়ো জলাশয়ের সামনে এসে সন্তরণের উৎসাহে উভয়ে বিবস্ত্র হয়ে জলে নেমে পড়ে। তাদের এই উন্মুক্ততায় ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা চারিদিক থেকে তাদের ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলে। অবাধ যৌনসম্পর্কের দেশেই যখন এই অবস্থা, তখন আমাদের অবদমিত যৌনস্পৃহার দেশে তার কী অবস্থা হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

সেদিন মেট্রো রেলের কামরায় কামমোহিত যুগল প্রেমের জোয়ারে ভেসে পরস্পরকে আরও আরও ভালোবাসিবার প্রেরণায় ও কাছে পাওয়ার তাড়নায় পরিবেশ প্রতিবেশ বিস্মৃত হয়ে যূথবদ্ধ হওয়ার প্রবল আবেগে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উন্মুক্ত প্রঙ্গণে জীবনমুখী ছবি দেখে তারা হয়তো ভেবেছিল, সমাজ এখন অনেক বেশি লিবারাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু লিবার্টিনিজম সম্পর্কে এখনও যে সমাজের মোহমুক্তি ঘটেনি, সেকথা বুঝতে ভুল হওয়াতেই বিপত্তি। তাই বোধ হয় রাস্তার কুক্কুর-কুক্কুরীর সংরাগ দেখে যেখানে এখনও ঢিল ছোঁড়ার নিরীহ আমোদের প্রবৃত্তি জাগে, সেখানে মানব-মানবীর এই শ্ববৃত্তিতে যে উলটো উৎপত্তি হবে তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তাই অস্বস্তির প্রতিবাদে যখন জনমত প্রখর হয়ে ওঠে, তখন মানে মানে কেটে পড়াই যে যুক্তিযুক্ত সেটির বিস্মরণ ঘটে যায়। বলদৃপ্ত উচ্চারণে তখন মনে হয় --'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত'। কিন্তু দশচক্রে ভগবান ভূত হয়, তো প্রেমিকযুগল কোন ছার? প্রেমে পড়লে মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম হয়, কামোন্মত্ত হলে তাকে ভূতে পেয়ে বসে। সেই নূতন যৌবনের ভূতগ্রস্ত অবস্থাতেই শেষ পর্যন্ত তারা সেই বিখ্যাত দমদমে গিয়ে ওঠে।

কে না জানে এই দমদম, দমাদম মস্ত কালান্দারের দমদম দাওয়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। শুরু হয়েছিল অবশ্য ফড়েদের বেশি লাভ করার বিরুদ্ধে সেই চিরাচরিত মূর্খস্য লাঠ্যৌষধির ব্যবহার দিয়ে। তারপর রাজনীতিতে এটির পেটেন্ট নেয় মারকাটারি মাকু পার্টি। এটি একদা পার্টির সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এমনকী শিল্পায়ন বাবার অভিযানে যখন একদা হলদি নদীর জল লাল হয়ে ওঠে, তখন প্রতিবাদী আন্দোলনকে শায়েস্তা করতে, মহিয়সী সংগ্রামী নেত্রী করাতি হলদিয়ার মহিলাদের দমদম দাওয়াইয়ের নিদান দেন। এখন তিনি কুটুরে পেঁচার মতো পার্টিবৃক্ষে করাতের সঙ্গে নিভৃত কূজনে ব্যস্ত থাকলেও সেই দমদম দাওয়াইয়ের মহিমা কিন্তু কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাই সেদিন সেই যুগলের প্রেমরোগের নিদান হিসেবে দমদম দাওয়াই গণধোলাইয়ের ব্যবস্থা কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে তা প্রত্যক্ষ নয়।

তবে তার ফলে নূতন যৌবনের ভূতেদের 'লিবারিস্ট' মহলে যে সাড়া পড়ে গেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমাদের দাবি মানতে হবে, প্রকাশ্যে প্রেম করার অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে। মেট্রো ট্রেনে ও স্টেশনে কামকলার অনুশীলনের মহান অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে। বস্তাপচা রক্ষণশীলতার বাধানিষেধ মানছি না মানব না। কাশ্মীরের স্বাধীনতা, নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা,যৌবনের স্বধীনতা দিতেই হবে। তারজন্য আমরা 'হোক আলিঙ্গন' আন্দোলনের জম্পেশ জুটিতে, গিনেস বুকে এক অবিরাম রেকর্ড সৃষ্টি করে বিশ্বকে চমকে দেব। বুর্জোয়া রক্ষণশীলতার বুড়ো ভাম, সাবধান সাবধান। লিবার্টি নিজম জিন্দাবাদ।

বঙ্গে আন্দোলনের ইতিহাসে বুভুক্ষু যৌবনের এটিই এখন সংগ্রামের হাতিয়ার। আরম্ভ হয়েছিল সংগ্রামীদের 'হোক কলরব' দিয়ে, তারপর এল মহান 'হোক চুম্বন' আন্দোলনের লাগাতার সংগ্রাম। এখন তৃতীয় অঙ্কে শুরু হয়েছে হোক আলিঙ্গন। চতুর্থ অঙ্কে হবে হোক সঙ্গম। তার থিম সং হবে-- 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি'। সঙ্গমে আপত্তি থাকলে পঞ্চমাঙ্কে অবধারিতভাবে আসবে 'হোক ধর্ষণ'। তার মন্ত্র হবে কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ। ধর্ষণ অনেকদিন ধরেই বঙ্গ বামপন্থীদের সংগ্রামের হাতিয়ার। এখন আমরা তাকে একটু শোধন করে নিয়ে যৌবন জলতরঙ্গের হাতিয়ার করে নেব।

একদা মার্কিন মুলুকে বার্কলেতে ফ্রি স্পিচ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আমরা করব ফ্রি অ্যাকশান আন্দোলন— হোক আলিঙ্গন থেকে হোক সঙ্গম ও হোক ধর্ষণ। স্মরণে থাকে যেন, পঞ্চাশ বছর আগে প্যারিসে উত্তাল যৌবনের বিস্ফোরণ। তাদের প্রাথমিক দাবি ছিল, মেয়েদের হোস্টেলে ছেলেদের অবাধ গমনের অধিকার। কী মহান দাবি, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বিভেদের কোনও দেওয়াল রাখা চলবে না। প্রাকৃতিক নিয়মে চলবে অবাধ ও লাগাতার সম্পর্কের টানাপোড়েন।

মুক্ত দুনিয়ার মুক্ত সম্পর্কে বিভোর যেসব সোহাগবালারা স্বেচ্ছা সহযোগের বৈপ্লবিক প্লাবনে শামিল, তাদের ক্ষেত্রে সব ঠিক আছে। কিন্তু ভিন্ন রুচির বুর্জোয়া মনোভাবে যারা বিশ্বাসী তাদের এই বীরর্ষভ অভিযান থেকে বাঁচাবে কে? অবশ্য মুক্তির মন্ত্রে একবার তন্ত্রাভিষিক্ত হতে পারলে আর কোনও বাধাই অবশ্য বাধা হয়ে উঠতে পারবে না। সাম্প্রতিক 'হোক আন্দোলনে' উদ্বুদ্ধ বীরপুঙ্গব ও বীরাঙ্গনাদের আলিঙ্গন আন্দোলনে ক্ষিপ্ত হয়ে অনেকে তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাউন্ডারদের সেইসব প্রতিক্রিয়াশীল কাজের নিন্দা করার ভাষা নেই। 'কন্ডোম কবি'র বাক্যের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বৃদ্ধকবি থেকে তরুণ কবি সংসদে গর্জে উঠেছিলেন। অচিরেই আশা করব তাঁরা সুখাবেশ থেকে জাগ্রত হয়ে মানুষের যৌনচর্চার স্বাধীনতার সপক্ষে সরব হবেন।

সরকার এখন আমাদের দেশে স্বচ্ছ ভারত নির্মাণে সরব ও সক্রিয়। জীবনের সর্বস্তরে যদি স্বচ্ছতা কাম্য হয়, তাহলে জীবনের আদি প্রবৃত্তি ও বৃত্তিকে কেন গোপন অন্ধকারে জিইয়ে রাখা হবে। আমরা এর একান্ত বিরুদ্ধে। ফ্রয়েড বলে গেছেন নর-নারীর স্বাভাবিক লিবিডোকে অবদমিত করলে তার বিষময় ফল হতে বাধ্য। সুতরাং আমরা তাই সহজ স্বাভাবিক জীবনের পক্ষে সমস্ত বাধা নিষেধ ভেঙে ফেলতে চাই। আমাদের এখনকার মূলমন্ত্র হলো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দা-আ-আ-ও। মুক্তকচ্ছ হয়ে মুক্ত মেলায় আমরা মুক্ত জীবনের চর্চা করি।

সেজন্য আমাদের ময়দানের উদার ক্ষেত্র প্রস্তুত। আমাদের 'হোক আলিঙ্গন' ও 'হোক সঙ্গমে'র পরম প্রেরণা রয়েছে খাজুরাহ কোনারকের উন্মুক্ত মন্দির গাত্রে। সুতরাং 'কামশাস্ত্রে'র দেশে বিভিন্ন বিভঙ্গে শাস্ত্র চর্চার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সেখানে নারী-পুরুষের যে ড্রেস কোড আছে সেটি অনায়াসে আমাদের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করে তুলতে হবে। ইতিমধ্যে প্রগতিশীল ধারায় স্বীকৃত, প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর ক্ষেত্রে অশন-বসন, চলন-বলন সম্বন্ধে যেসব কৃত্রিম নিষেধের বেড়া তৈরি হয়েছে সেটিকে সর্বাংশে পরিত্যজ্য করতে হবে। ' যার ধর্ম তার কাছে' কথার মতো যার বর্ম তার কাছে, যার বস্ত্র তার কাছে, সরকারের কী করার আছে। আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের বিশেষ করে নারীর এত বস্ত্র বাহুল্যের কী প্রয়োজন । সে ব্যাপারে আমরা অনায়াসেই প্রগতিশীল হিন্দি ছবি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। বরফের দেশের চিত্রায়নে দেখা যায়, উচ্চতা যত বাড়ছে, নায়িকা তত মুক্তবসনা হয়ে নেচে নেচে সুদৃশ্য পোশাক পরা নায়কের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকার মুক্তবসনা বীরাঙ্গনাদের প্রেরণায় আমাদের দেশেও বিভিন্ন শহরে স্বেচ্ছাব্রতা স্বল্পবসনা মেয়েদের মিছিল হয়ে গছে। মুক্তমনা নারীরাও অঙ্গীকার করছেন-- নারীর দেহ তার একান্ত নিজস্ব, সেটি নিয়ে তার যথা ইচ্ছা তথা করার একান্ত অধিকার রয়েছে। অতিশয় হক কথা, তা নিয়ে কারোর কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু মুনিদের ধ্যানভঙ্গ করতে কিংবা দেশে বিদেশে চলচ্চিত্রের তারাভিলাষীদের 'Me too' আন্দোলন কেন করতে হয় সেটাই বিরাট রহস্য। এই Me too -এর শিকার নারীদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় তারা স্বেচ্ছায় ধর্ষণের গৌরবে গৌরবান্বিত। তারপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারা সতী সাবিত্রীরূপে আন্দোলনে শামিল হন।

আামাদের শাস্ত্রে বিষে বিষক্ষয় বলে একটা কথা আছে। তাহলে কি হোক সঙ্গম বা হোক ধর্ষণ আন্দোলনের ফলে দেশ জুড়ে যে এই সমাজের একশ্রেণীর ধর্ষণোৎসব চলছে, তার কোনও সুরাহা খুঁজে পাওয়া যাবে? সেটাই এখন চিন্তার বিষয়। ■

চিঠিপত্র

এরই নাম আধুনিকতা!

সাম্প্রতিক যে ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভাগাড়ের পচা মাংসের কাণ্ড'কেও পিছনে ফেলে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিল সেটা হলো— 'কলকাতা মেট্রোয় আলিঙ্গন কাণ্ড'। প্রগতিশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের প্রেম, তাদের যৌনতা— সেখানে কিনা একদল চোখে চালশে পড়া পিছিয়ে পড়া রক্ষণশীল সমাজের কাকু, জেঠু, দাদু বাধা হয়ে দাঁড়াবে; শাসন করবে; গায়ে হাত তুলবে? এটা তো কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এই সব বুড়োভামরা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, একদিন তাদের যুবা বয়সে যে সমাজ পাল্টানোর স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন, সেই সমাজটাকে ওরা পাল্টে ফেলেছে! আজ ভিক্টোরিয়া, নলবন, নন্দন, বাবুঘাট থেকে শুরু করে শহরের প্রতিটা পার্কে ওদের উদ্দাম প্রেমের অর্ধনগ্ন প্রতিচ্ছবি। ওরা সমাজ পাল্টানোর কারিগররা যাদবপুরে মেয়েদের অন্তর্বাস পরে, ন্যাপকিনে স্লোগান লিখে বিপ্লব করে। ওরা প্রগতিশীল, ওদের আধুনিক প্রতিবাদের কোনও ধারণা নেই ওই বুড়োদের কাছে! আর জীবনমুখী নচিকেতা তো কবেই গান বেঁধেছিলেন— 'প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া এই দেশে অপরাধ, ঘুষ খাওয়া কখনওই নয়।'

অতএব, ওরা আর নির্জন পার্কের কোণে, সিনেমা হলের অন্ধকারে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায়, ট্রেনে-বাসে-মেট্রোয়, বাসস্টপে, শপিংমলে নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে জড়িয়ে ধরবে, চুম্বন করবে আর প্রগতির ধ্বজা তুলে যা যা করা যায় সবই করবে। কোনও দাদা, কাকু, জেঠুর যদি তাতে অসুবিধা হয় তবে তারা হয় রাস্তায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন-সহ বেরোবেন না, আর নয়তো চোখ বন্ধ করে থাকবেন। ভুলেও প্রতিবাদ করবেন না। দেখছেন না বাংলার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিবেকবান চিন্তাশীল সহানুভূতিশীল জনগণ ওদের পক্ষে আছেন!

স্বামীজি বলেছিলেন— "হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি, বিচারশাস্ত্র (বা) বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে-ভাবের, যে-আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভালো; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?" প্রতিটি জাতির সমাজ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সেই জাতির ঐতিহ্য এবং হাজার হাজার বছরের কর্মের উপর ভিত্তি করে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি দিনরাত জোর করে আমাদের ভেঙেচুরে অপর জাতির মতো গড়ে তোলার যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার ফল আমাদের পক্ষে অমৃত তো নয়ই, বরং বিষবৎ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর সেই বিষেরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আজ সমাজের সর্বত্র। কবিগুরু বলেছেন, 'শিক্ষাকে কেবল বহন করলে চলবে না, বাহন করতে হবে। শিক্ষাকে যদি আমরা সত্যিই বাহন করতাম তাহলে বুঝতাম পাশ্চাত্য ভাষা, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার অনুকরণ করলেই তা নিজের হয়ে যায় না, অর্জন না করলে কোনওকিছুই নিজের হয় না। তাই আমাদেরকে আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা আর ইতিহাসলব্ধ জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতেই হবে।

—শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী,
৮, পটারি রোড, এন্টালি,
কলকাতা-১৫।

ত্রিপুরায় গো-হত্যা ও ধর্মান্তরকরণের হুমকি

অতি সেকুলারবাদের ফসল ধর্মনগর তথা ত্রিপুরাবাসী বাঙালি হিন্দুরা উপভোগ করতে শুরু করেছে। ধর্মের তাগিদে যে জাতি ওপার থেকে এপারে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল, সেই জাতি ও তাদের বংশধররা যখন এপারে এসে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দেও নদী, মনু নদী ও গোমতীর জলে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠবোধ করল না তখন আর আত্মহনন ছাড়া এ জাতির কীই বা করার আছে? গত পয়লা বৈশাখে যখন বাঙালি হিন্দু ইলিশমাছ আর পাঁঠার মাংসের দরকষাকষিতে ব্যস্ত, তখন ধর্মনগর শহরের চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মাছমারা নামক স্থানে কতিপয় মুসলমান একটি গোরু জবাই করে। যেখানে কয়েক বছর আগেও মুসলমানের নামগন্ধ ছিল না, সেখানে এই কয়েক বছরে কী এমন মিরাকেল ঘটে গেল যে, মহা নবির অনুসারীরা কাফের অধ্যুষিত অঞ্চলে পুরো দস্তুর বসতি গড়ে, মসজিদ বানিয়ে পাঁচওয়ক্ত নমাজ আদায় করে নববর্ষের দিনে কুরান নির্দিষ্ট অবিশ্বাসীদের দোজখের সর্বনাশা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করার জন্য এদের পূজিত গো-দেবতাকে কুরবানি দেওয়ার সুমহান কাজটুকু সমাধা করল? যদিও পরবর্তীতে বজরংদলের হস্তক্ষেপে প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ফেসবুক-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আপামর মুসলমান মানসিকতা যেভাবে এদেশে গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ ও বিক্রয়ের উপর প্রতিবন্ধকতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আক্রমণ বলে তর্জন-গর্জন করছে, তদুপরি হিন্দুদের নেপালে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে, তা ত্রিপুরার বাঙালি হিন্দু সমাজের কাছে এক বিশাল অশনি সঙ্কেত। এই এলাকা থেকে গত পাঁচ-ছ'মাস আগে এক হিন্দু মহিলা তার ষোল বছরের মেয়ে ও দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে ধর্মনগর সাঁকাইবাড়ি স্থিত কালা মিঞার সঙ্গে পালিয়ে এসে ধর্মান্তরিত হয়ে তাকে নিকাহ করে। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও পারিবারিক সমস্যা তৈরি হয় তবে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রথমত, বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা হয় এবং তা যদি আদালত অনুমোদন করে তবেই স্ত্রী অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে অথবা অন্য ধর্মগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে মুল্লা মৌলবিরা সে পথে না গিয়ে কালা মিঞাকে দিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের এক গৃহবধূকে পুত্র কন্যা-সহ অপরহণ, ধর্মান্তরণ ও নিকাহ্ দেওয়া নিশ্চয়ই শরিয়তের অনুমোদিত লাভ জেহাদেরই এক চরম

দৃষ্টান্ত। আর নববর্ষের পরদিনই ধর্মনগর শহরের কেন্দ্রস্থলে এক হিন্দু স্কুলছাত্রীকে জিলা কারাগারের কোয়ার্টারে এক মক্ষীরানির সহায়তায় পাঁচজন মুসলমান যুবক সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আটকে রেখে বলাৎকারের চেষ্টা চালায়। এই পাঁচ দুষ্কৃতীরা হলো মোহম্মদ মুস্তাফা আহমেদ, আমর হুসেন, রিয়াজউদ্দিন, মোহম্মদ কলিমউদ্দিন ও মানা মিঞা। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণের হস্তক্ষেপে পুলিশ প্রশাসন দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। যেসব ব্যক্তি প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেন তাদের এখনও দুষ্কৃতীদের সাকরেদ এবং মুসলমান সমাজ থেকে নিরন্তর হুমকি দেওয়া হচ্ছে কেসটা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য।

এখানে একটা জিনিস উল্লেখ্য যে, এই নাবালিকা স্কুলপড়ুয়া হিন্দু ছাত্রীটি তার দাদুর বাড়ি নয়াপাড়াতে থেকে পড়াশোনা করে। সন্ধ্যার পর মেয়েটি প্রাইভেট টিউটরের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

—সুবুদ্ধি রায়,
ধর্মনগর, ত্রিপুরা।

বাংলাদেশের থেকে শিক্ষা নিন

সত্যিকারের বাংলাদেশের মতো একটি ছোট্ট দেশ যা করে দেখাতে পারে, ভারত তার কানাকড়িও করে দেখাতে অক্ষম। ভোট না পাওয়ার ভয়ে এদের সাহসিকতার বড়ো অভাব। এ ব্যাপারে ভারতকে বাংলাদেশের কাছে শিক্ষা নেবার আছে। কারণ শিষ্যও অনেক সময় গুরুদেবের ওপরে ওঠে। ভারতে এখনও কেন পাকিস্তানের জাতির পিতার ছবি থাকবে, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অফিস আদালতে। তাহলে আর দেশ ভাগের দরকার কী ছিল। সবাই তো মিলেমিশে থাকা যেত।

বাংলাদেশের কিছু স্বনামধন্য নেতা এদেশের কিছু নেতাকে প্রায় কটাক্ষ করেই বলেছেন যে, দেশভাগের পর অন্য দেশের জাতির পিতার ফটো থাকবে আর তাকে স্বীকার করে নিতে হবে, তাহলে সেগুলি ন্যাকামি ছাড়া আর কী হতে পারে। কেন এদেশের কিছু নেতা এই বৈষম্যকে মেনে নিচ্ছে সেটাই তাদের কাছে উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশ তো দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা জিন্নার ছবিকে কবেই উৎখাত করেছে। তাদের দেশে জিন্না অ্যাভিনিউকে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ করেছে। জিন্না হলকে মাস্টারদা সূর্য সেন হল করেছে। এতে তো তাদের সম্মানে বাধেনি। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য বাপ্পাদিত্য বসু বলেছেন, ''জিন্নার কারণেই আমাদের আজকের এই বিভাজন।'' এছাড়াও ৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গারও হেড মাস্টারও ছিলেন এই জিন্নাসাহেব। তার কথায় ভারতের কোথাও বা বাংলাদেশের কোথাও এই জঘন্য মানুষটির ছবি থাকা মানেই 'তাকে পুরস্কৃত করা'। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আসাদুজ্জামান বলেন, ''আলিগড়ে জিন্নার ছবি থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'' তার ভাষায় এটা এই উপমহাদেশের মানুষের লজ্জা। এ ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা কেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। সে প্রশ্নও তুলেছেন এই স্পষ্টবাদী নেতা। ধন্যবাদ, বাংলাদেশের সাহস আছে বটে! এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্পাদক আনুয়ার কবির জিন্নার বিষয় একটি ধর্মীয় বিষয় নয় বলে উল্লেখ করেছেন। আনোয়ার সাহেব জিন্নাহকে কলকাতায় ঘটা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মূল পাণ্ডা বলে উল্লেখ করেছেন। আনোয়ার কবির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আঙুল তুলেছেন, সেটা হলো, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান কথাটি কেন উল্লেখ থাকবে। যে জন্য তিনি বলেছেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে মুসলিম কথাটি ছেটে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশের বিখ্যাত সোলাকিয়া মসজিদের ইমাম মৌলানা ফরিদুদ্দিন মাসুদ জানিয়েছেন, ''জিন্নার মতো জঘন্য লোকের ছবি শুধু আমি কেন হিন্দু মুসলমান কারোই মানা উচিত নয়''। তাঁর কথায়, জিন্নার ছবি রাখার যদি এতই ইচ্ছা তবে কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর ছবি সরাতে এরা কেন মেতে উঠেছিল। এটাই বড়ো বিস্ময়ের। ধন্য নেতা। প্রণাম জানাই! ভাবছি আমাদের দেশের কিছু নেতার কবে সুবুদ্ধি হবে, জঘন্য কিছুকে সমর্থন না করে জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করার।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

স্বস্তিকার লোগো-র রং অপরিবর্তিত থাকা বাঞ্ছনীয়

আমি স্বস্তিকার একনিষ্ঠ পাঠক, পত্রিকার প্রচার ও প্রসারের কাজে যদি তিলমাত্র কোনও কাজে লাগতে পারি তবে তা সৌভাগ্য মনে করি। দীর্ঘ ২৫ বছর 'জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপন' জগতে আমার আনাগোনা পেশাগত কারণে। সেই সামান্য অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই স্বস্তিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। পত্রিকার রঙিন প্রচ্ছদে 'স্বস্তিকা' শুধু পত্রিকার নামই নয়, এটি লোগো-ও বটে। মহান ব্রত নিয়ে চলা এই পত্রিকার ক্ষেত্রে সমীহ সহকারে নিবেদন করতে চাই— এক এক সংখ্যায় এক এক রংয়ের ব্যবহার সম্পর্কে। লোগো-ই হাউস আইডেন্টিটি, যা অপরিবর্তিতই থাকাটা দস্তুর। মানুষের মনে লোগো-র রং আর হরফ বা ডিজাইন সেই হাউসকে, প্রোডাক্টকে, ব্র্যান্ডকে মনে করিয়ে দেয়।

স্বস্তিকার একটি নিজস্ব রং থাকলে ক্ষতি কী? বাটা, আউটলুক ম্যাগাজিন ইত্যাদি ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে— চোখ বন্ধ করে ভাবলে আমাদের মনশ্চক্ষু সেই ব্র্যান্ড, হাউসকে মনে করাতে নিমেষমাত্র সময় নেয়। আর প্রিন্টিং সম্বন্ধে যদি বলেন— আগে আমার লোগো রক্ষা হবে, তারপর বাকি রং ঠিক করাটাই দস্তুর। সকালে উঠেই আমরা সকলেই চা সহযোগে বিস্কুট খাই— বিস্কুটের মোড়োকটি দেখবেন তাতে কি রোজ একই কোম্পানি নতুন নতুন রংয়ের লোগো ছাপে? এ বিষয়ে আমার ছোট্ট নিবেদন রইল সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে।

—মিতালী সাহা,
২১/১এইচ, ফার্ন রোড,
কলকাতা-৭০০০১৯।

বিজ্ঞানচর্চায় ভারতীয় নারীর অবদান

পারুল মণ্ডল (সিংহ)

কিছুদিন আগে একটি ছবি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছিল আই এস আর ও-র অফিসে ভারতের মার্স অরবিটার মিশনের সাফল্যে উৎফুল্ল এক দল মহিলা বৈজ্ঞানিক একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করছেন। মূলত তাঁদের প্রচেষ্টাতেই এই সফল উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়েছিল। ছবিটির মূল আকর্ষণ ছিল, এই মহিলা বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যেকেই সাবেকি শাড়ি, গয়না, মাথায় ফুল দ্বারা সজ্জিত, যাদের আমরা সহজেই আমাদের মাসিমা, কাকিমা, পাশের বাড়ির জেঠিমাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞান চর্চার উপর পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারবোধ ভাবা হতো। ভারতবর্ষের তুলনায় পাশ্চাত্যে এই ধারণা ছিল প্রবল। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তৃতীয় শতকের রোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিক হাইপেশিয়াকে খুন হতে হয়েছিল। যদিও ভারতবর্ষে প্রাচীন সময়েও শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক নারীদের সমাজে সম্মানের চোখেই দেখা হতো। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় নারীদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। দ্বাদশ শতকে গণিতজ্ঞ ভাস্করের কন্যা লীলাবতীর নাম উল্লেখযোগ্য। ভাস্করের গণিতশাস্ত্রের বই 'লীলাবতী' মূলত কন্যার সঙ্গে তাঁর গাণিতিক বিষয়ে কথোপকথন, প্রশ্ন-উত্তর ও সমস্যা-সমাধানের উপর নির্ভর করেই লেখা। সেইজন্য তিনি তাঁর গ্রন্থের নামও তার মেয়ের নামে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতের মতো মধ্যবিত্ত প্রধান দেশে বাড়ির মেয়েদের বিজ্ঞান পড়ানোর প্রচলন বিগত শতক পর্যন্ত অত্যন্ত কম ছিল। বাড়ির ছেলের পাশাপাশি মেয়েকেও বিজ্ঞান পড়ানোর খরচ জোগান দেওয়া বড় বাধা ছিল। বিবাহের উপযুক্ত করে তোলার জন্য সাহিত্য বা দর্শন বা কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু তাই বলে কি ভারতে মহিলারা বিজ্ঞানচর্চায় পিছিয়ে ছিলেন? একদমই নয়। সামাজিক পশ্চাৎপদ চিন্তাভাবনার বেড়াজালকে অতিক্রম করে বহু ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞান শাখায় তাঁদের উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে গেছেন। ২০০৮ সালে

ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে রোহিনী গোড়বোলে ও রাম রামাস্বামী সম্পাদিত "Lilavati's Daughters" (লীলাবতীর কন্যারা) নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত করা হয়। এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের মহিলা বৈজ্ঞানিকদের জীবনী ও তাঁদের গবেষণার কাজ লোকসম্মুখে তুলে ধরা।

এক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় তিনি হলেন আনন্দবাঈ যোশী। মহারাষ্ট্র নিবাসী এই মহিলার মাত্র ৯ বছর বয়সে তাঁর থেকে কুড়ি বছরের বড় বিপত্নীক পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৪ বছর বয়সে আনন্দীবাঈ একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু চিকিৎসার অভাবে কিছুদিন পরেই তাঁর পুত্র মারা যান। তিনি নিজেও শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। পুত্র মৃত্যুর শোকে তাঁর মনে জেদ চেপে যায় চিকিৎসক হবার জন্য। তার স্বামীও এ কাজে তাঁকে উৎসাহিত করেন। তিনি বিদেশে যান ও পেনসিলভানিয়ার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে এমডি করেন। দেশে ফেরার

পর কোলাপুর অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড হসপিটালের মহিলা বিভাগে তাঁকে ফিজিশিয়ান-ইন-চার্জ নিয়োজিত করা হয়।

জানকী আম্মাল (১৮৯৭-১৯৮৪ খ্রি:) সেই সময় বোটানি নিয়ে গবেষণা করেন যখন বেশিরভাগ মহিলা সাহিত্য বা কলা বিভাগে পড়াশোনা করতেন। তিনি ঔষধিগুণসম্পন্ন ভেষজের উপর গবেষণা করেন। ব্রিটেনে গিয়েও কিছুদিন কাজ করেন। বোটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল পদেও কাজ করেন।

ড. কমলা সোহনি (১৯১২-১৯৯৮) ছিলেন বিজ্ঞান শাখায় ডক্টরেট উপাধি পাওয়া প্রথম মহিলা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো তিনি যখন আই আই এস সি-তে রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য আবেদন করেন তখন তাঁর আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয় কেবলমাত্র তিনি মহিলা ছিলেন বলে। যাইহোক তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে প্রেফেসর সি ভি রামন তাঁকে নিজের ছাত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন ও গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেন। তিনিই ছিলেন সি ভি রামনের প্রথম মহিলা শিক্ষার্থী। কমলা সোহনি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যগুণের উপর অত্যন্ত মৌলিক গবেষণা করেন। এছাড়া আন্না মানিও (১৯১৮-২০০১) প্রোফেসর রামনের ছাত্রী ছিলেন। তিনি একজন সফল পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। মেটেরোলোজির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান।

রসায়ন শাস্ত্রে অসীমা চ্যাটার্জির (১৯১৭-২০০৬) অবদান অনস্বীকার্য। তিনি অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি ও ফাইটো কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে অসাধারণ গবেষণা করেন। এছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত ঔষধিগুণসম্পন্ন ভেষজ উদ্ভিদের উপরও গবেষণা করেন। এছাড়াও রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি, দর্শনা রঙ্গনাথন, মহারানি চক্রবর্তী, চারুশিতা চক্রবর্তী— এঁরা প্রত্যেকেই হলেন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় মহিলা বৈজ্ঞানিক। আরও একজন যার কথা না উল্লেখ করলেই নয় তিনি হলেন মঙ্গলা নাচলিকর। বিবাহের ১৬ বছর পর মঙ্গলা গণিতে তাঁর গবেষণা সমাপ্ত করেন। তিনি কঠিন কঠিন গাণিতিক সমীকরণকে যথাসম্ভব সরলীকরণ করেন। গণিতকে বিদ্যার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ■

গরমকালে রোগভোগ

অনন্যা চক্রবর্তী

মিতানের বয়েস পাঁচ বছর। গরমকালে তার সব থেকে প্রিয় আইসক্রিম আর কোল্ড ড্রিঙ্কস। সেই সঙ্গে আরও একটা প্রিয় খাবারের কথা সে সবার কানে কানে বলে। শুনতে পেলেই মা বকে, তাই এই গোপনীয়তা। প্রিয় খাবারটির নাম গোলা। কুঁচো বরফের সঙ্গে সিরাপ মিশিয়ে তৈরি। খিদিরপুরের যে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সে পড়ে তার গেটের সামনে একজন বিক্রি করেন। মিতান একবার মায়ের চোখ এড়িয়ে খেয়েছিল। কিন্তু মা ঠিকই জানতে পেরেছিল। সেবার মিতান এত বকা খায় যে গোলা আর খাওয়া হয়নি। মিতানের মা ভুল কিছু করেনি। ডাক্তারবাবুরাও বাচ্চাদের এসব খেতে বারণ করেন। কারণ এসব খেলে নানা ধরনের অসুখ হতে পারে। কী ধরনের অসুখ একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

চিকেন পক্স :

গরমকালে চিকেন পক্সের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। এই অসুখ কষ্টদায়ক তো বটেই, সময়ে চিকিৎসা না হলে প্রাণহানিকর। এর থেকে বাঁচতে ডাক্তারবাবুরা বেশি করে ঠাণ্ডা জল খাবার পরামর্শ দেন। সঙ্গে অবশ্যই রাখতে হবে মরশুমি ফল।

ডায়েরিয়া :

কাটা ফল, ঠাণ্ডা পানীয় এবং কাঠি আইসক্রিম গরমকালে বাচ্চাদের মতো বড়োদেরও খুব প্রিয়। ঠাণ্ডা পানীয় বা আইসক্রিম খেলে শরীরের তাপমাত্রা এক ঝটকায় অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু একই সঙ্গে ডায়েরিয়ার সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয়। অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং অশুদ্ধ জল পান করার ফলেই ডায়েরিয়া হয়। এক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ, জল ফুটিয়ে খান। সেইসঙ্গে শাকসবজি ভালো করে ধুয়ে তারপর রান্না করা উচিত।

ডিহাইড্রেশন :

গরমের সঙ্গে ডিহাইড্রেশনের একেবারে রাজযোটক সম্পর্ক। গরমকালে ঘাম বেশি হয়। তাতে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। একেই ইংরেজিতে ডিহাইড্রেশন বলে। ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ, ডিহাইড্রেশন হলে বেশি করে জল তো খেতেই হবে, সেইসঙ্গে ডাবের জলও নিয়মিত খাওয়া দরকার। তরমুজও খুব উপকারী।

সান স্ট্রোক :

সান স্ট্রোক বা হিট স্ট্রোক। প্রচণ্ড গরমে কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দিলে জ্ঞান আবার ফিরে আসে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এত সহজ নাও হতে পারে। হিট স্ট্রোকে আক্রান্তদের মধ্যে কেউ কেউ কোমায় চলে যান। অনেক সময়ে তাদের মৃত্যুও হয়। কাগজ খুললে দেখা যায় হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর খবর। সুতরাং হিট স্ট্রোক খুবই সাঙ্ঘাতিক। এর হাত থেকে বাঁচতে দু-একটা সহজ নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ, গরমকালে ভারী জামাকাপড় পরা চলবে না। তাতে শরীরের তাপ ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। বাইরে বেরোলে ছাতা নিয়ে বেরোতে হবে। প্রচুর জল খাওয়া দরকার এ সময়। গরমকালে জন্ডিস এবং টাইফয়েডের প্রকোপও বাড়ে। জন্ডিস জলবাহিত জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট রোগ। রক্তে হেপাটাইটিস এ ভাইরাস থাকলে জন্ডিস হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া, প্রচুর জলপান এবং নিয়মিত এক্সারসাইজ করলে জন্ডিসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। একই কথা প্রযোজ্য টাইফয়েডের ক্ষেত্রেও। জন্ডিসের মতো টাইফয়েডও জলের মাধ্যমে ছড়ায়। ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ, টাইফয়েডের হাত থেকে বাঁচতে নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া করতে হবে। যথেচ্ছ পোটাটো চিপস বা জাঙ্ক ফুড একেবারেই চলবে না। একটু সতর্ক হলে গরমকাল বেশ ভালোই কাটবে।

সারারাত আল্লাহ্ হো আকবর সকালে শকুনের ভোজ

প্রণব দত্ত মজুমদার

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতার বুকে ঘটে গিয়েছিল বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা— 'দি গ্রেট কল্যাকাটা কিলিংস'। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে একটু এর আগের কথা বলে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ সালে ইংরেজ সরকার ও ঢাকার নবাব সালিমুল্লার ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লিগ। মুসলিম লিগ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথম প্রথম তেমন কোনও গুরুত্ব অর্জন করতে পারেনি যতদিন পর্যন্ত না তারা গান্ধীজীর আশীর্বাদ লাভ করেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ ঘটেছিল ১৯১৫ সালে। ইংরেজের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ইংরেজের গুণমুগ্ধ গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতের রাজনীতিতে আহ্বান করে আনেন নরমপন্থী কংগ্রেসিদের নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

মুসলিম লিগ ভারতের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে গেল যখন ১৯১৯ সালে গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে মুসলিম লিগের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক 'খিলাফত' আন্দোলনকে জুড়ে দিয়েছিলেন। 'খিলাফত' আন্দোলন ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফাতন্ত্রের অবসান হলে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে কট্টরপন্থী মুসলমানদের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। আসলে গান্ধীজী তখন হিন্দুদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও মুসলমানদের কাছে ছিলেন না। তাই তিনি মুসলমানদের তোষণের রাস্তা ধরেছিলেন মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে। যদিও এরকম ধর্মীয় আন্দোলনকে মদত দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে বারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে লালা লাজপত রায়, মদনমোহন মালব্য, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন চন্দ্র পালের মতো ব্যক্তিত্বরা। গান্ধীজী শোনেননি তাঁদের কথা। বলা চলে, এর ফলে ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যৌক্তিকতাকে পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছিলেন গান্ধীজী ও তাঁর কংগ্রেস।

গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের মুসলমান তোষণের নীতি ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম লিগের পায়ের তলায় জমি তৈরিতে ভালোরকম সাহায্য করেছিল। ইংরেজ সরকার মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবৃক্ষের যে বীজ বাংলার মাটিতে পুঁততে সাহায্য করেছিল, গান্ধীজীর ক্রমাগত প্রশ্রয়ে তা পল্লবিত ও কুসুমিত হতে থাকলো। অবশেষে সেই বিষবৃক্ষে মুকুল

১৯৪৬। কলকাতার রাজপথে মৃতদেহের সারি।

ধরল ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে যখন মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের (পরে নাম ঠিক হয় পাকিস্তান) প্রস্তাব পাশ করে মুসলিম লিগ। 'Two Nation theory'র ব্যাপারে মুসলিম লিগ নেতা আলি জিন্না বলেছিলেন— ''We maintain and hold that Muslims and Hindus are major nations by definition or test of nation. We are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, customs, history and tradition, aptitudes and ambitions. In short, we have our distinctive outlook on life and of life.'' সুতরাং মুসলমান জাতির আলাদা সত্তার কারণে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য হিন্দু কালচারের পরিমণ্ডল থেকে সরে গিয়ে আলাদা দেশ গঠন করতে হবে— এই ছিল তাদের দাবি। ভারতের কমিউনিস্টরা 'পাকিস্তান' সৃষ্টির দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিল— ''The 'Pakistan' is a just, progressive and national demand''। 'বঙ্গীয় তফশিলি ফেডারেশন'-এর নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও সর্বশক্তি দিয়ে জিন্নার পাকিস্তান দাবির পক্ষে লড়েছিলেন। বর্ণ হিন্দুদের প্রতি ঘৃণার কারণে তিনি মনে করতেন মুসলমানরা তফশিলিদের স্বাভাবিক মিত্র। অথচ তফশিলিদের সর্বভারতীয় নেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর তা মোটেই মনে করতেন না। আম্বেদকর বলেছিলেন— ''তপশিলিদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তারা হিন্দুদের অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল''। বাবাসাহেব এও লিখেছেন— 'বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, মুসলমানরা হিন্দুদের কাফের হিসেবেই গণ্য করে; ওদের মতে এই কাফেরদের রক্ষা করার চেয়ে মেরে ফলাই উচিত'।

যাইহোক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানারকম রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংরেজ সরকার ঠিক করে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। সেই কারণে ১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে এখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ফয়সলা করার জন্য। আলোচনা যাই হোক না কেন, মুসলিম লিগ নেতা জিন্না মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তানের দাবিতে অনড় হয়ে রইলেন।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মুসলিম লিগ বুঝল বিষবৃক্ষের ফল আহরণের সময় এসে গেছে। তাই মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই বম্বেতে তাদের সর্বভারতীয় সভায় সিদ্ধান্ত নিল যে তাদের 'পাকিস্তান' দাবি মেনে নেওয়া না হলে ১৬ আগস্ট শুক্রবার থেকে তারা দাবি আদায়ের জন্য ডাইরেক্ট অ্যাকশন করবে। ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলতে কী বোঝাচ্ছেন তা জানতে চাওয়া হলে জিন্না বলেছিলেন— ''To day we bid goodbye to constitutional methods.–today we have forged a pistol, and we are in a position to use it.'' মুসলিম লিগের একটি প্রচারপত্র বলা হয়— ''কয়েদ-এ-আজমের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক এসেছে। —মুসলিম নেশন তৈরি করার যে তীব্র ইচ্ছা মুসলমানরা এতদিন পোষণ করেছে তা পূরণ করার জন্য প্রকাশ্যে লড়াই করার দিন এসে গেছে। —পবিত্র লড়াই করে তোমরা সব জান্নাতে যাবে। —এস আমরা চিৎকার করে বলি জয় পাকিস্তান, জয় মুসলিম নেশন, জয় মুজাহিদিনদের জয়''। ডাইরেক্ট অ্যাকশন আসলে ইসলাম বিশ্বাসীদের জিহাদের নামান্তর। জিহাদ হলো ইসলামিক রাষ্ট্র দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ আর যারা সেই যুদ্ধ করে তারা হলো মুজাহিদ বহুবচনে মুজাহিদিন। জিহাদ করা মুসলমানদের অতি পবিত্র কাজ এবং জিহাদ করলে মুজাহিদিনরা অবশ্যই জান্নাতে (স্বর্গে) জায়গা পাবে। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে প্রাদেশিক সরকারের নির্বাচনে মুসলিম লিগ অবিভক্ত বাংলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন সুরাবর্দি। মুসলিম লিগ তাই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামক জিহাদ করার জন্য সুবিধাজনক জায়গা হিসাবে বাংলাকে বেছে নিয়েছিল।

পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া মিলছে না দেখে মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট শুক্রবার হরতালের ডাক দেয়। ওইদিন সকালে নমাজের পরে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে হাজার হাজার মুসলমান নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অকটরলনি মনুমেন্ট (এখনকার শহিদ মিনার)-এর সামনে এসে জমায়েত হলো। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি, কলকাতার মেয়র এস এন ওসমান, মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ইত্যাদি নেতারা গরম গরম বক্তৃতা করে মুসলমান জনতাকে উত্তেজিত করে চলে গেলেন। মিটিং শেষ হতেই মুসলিম জনতা 'আল্লা হু আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সারা কলকাতায় পূর্ব পরিকল্পনামাফিক আরম্ভ হয়ে গেল অবাধ লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, হিন্দু হত্যা, নারী নির্যাতন। কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তিনদিন ধরে চলেছিল সুপরিকল্পিত হিন্দু সংহার যজ্ঞ। চারিদিকে শুধু মৃতদেহের ছড়াছড়ি আর তা ঘিরে শকুনের ভিড়। ইতিহাসে এই নৃশংস ঘটনাকে দ্য ক্যালকাটা কিলিংস্ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ভয়াবহ হিন্দু নিধন যজ্ঞের একটু নমুনা দিলাম—

মেটিয়াবুরুজে ওড়িয়া শ্রমিকদের একটা বস্তি ছিল। সেখানে প্রায় ৫০০ শ্রমিক থাকতো। সেই বস্তি ঘিরে ফেলে জিহাদিরা গণহত্যালীলা চালায়। ওখানকার লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভেঙে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

তখনকার দিনের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন ৮৫ বছরের যাদব চক্রবর্তী। আপার সার্কুলার রোডে থাকতেন। ১৬ আগস্ট সকালে কয়েকশো মুসলান দাঙ্গাবাজ তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে লুটপাট চালায়। বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। পুরুষেরা নিকটবর্তী থানায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা

করে। বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস থাকতেন দিলখুশ স্ট্রিটে। তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে লুটপাট করে মুসলমান দাঙ্গাবাজরা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের বড়ো ছেলে পার্ক সার্কাস এলাকায় জিহাদিদের হাতে খুন হন। তাঁর নাতি কোনওরকমে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ভীমচন্দ্র নাগের পুত্র জিহাদিদের হাতে খুন হন।

তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের বহু গণ্যমান্য লোকের বাড়ি লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয় জিহাদিরা। ওই অঞ্চলের বিখ্যাত মাড়োয়ারি পরিবার— দয়ারাম পোদ্দারের পরিবার। ওই বাড়ির আনন্দিলাল পোদ্দার ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। শত শত মুসলমান দাঙ্গাবাজ তাঁর বাড়ি ঘিরে লুটপাট আরম্ভ করে। বাড়ির মহিলারা পাশের বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক পুলিশ সার্জেন্টকে ধরে ৫ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে সক্ষম হন। মুসলমান দাঙ্গাবাজরা ওই বাড়ি থেকে তখনকার দিনে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা লুটে নিয়ে গেছিল।

রতু সরকার লেনের মাড়োয়ারি ছাত্রদের হোস্টেল 'নিস্তারিণী' আক্রমণ করে জিহাদিরা। ১৯ জন ছাত্র থাকত তখন। ১৮ জন ছাত্রই খুন হয়েছিল জিহাদিদের হাতে।

মুসলিম জিহাদিরা ১৭ আগস্ট সকালে পার্ক সার্কাস এলাকার অভিজাত হিন্দু বাড়ি আক্রমণ করে। তারা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিস্টার বি কে রয় ও বিচারপতি মিস্টার এস কে ব্যানার্জিকে হত্যা করে। বিখ্যাত চিকিৎসক দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল বসু, মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ড. ইউ পি বসু, আই সি এস-পি সি দে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট মিস্টার বি সি দত্ত ইত্যাদি অভিজাত ব্যক্তিদের বাড়ি লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে।

পুলিশের প্রাক্তন ডি জি গোলক বিহারী মজুমদার আই পি এস, তাঁর একটি প্রবন্ধে 'ছেচল্লিশের আতঙ্কের দিনগুলি ভুলিনি'তে লিখেছেন— ''—হিন্দু মেয়েদের উপর ওদের বরাবর লোভ। ইউনিভারসিটি খোলা ছিল। রাজাবাজারের উপর দিয়ে আমাকে

পূর্ব পরিকল্পনামাফিক শুরু হয় কলকাতা জুড়ে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু হত্যা, নারী নির্যাতন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তিনদিন ধরে চলে অবাধে হিন্দু সংহার যজ্ঞ। ইতিহাসে এই নৃশংস ঘটনাকে 'দ্যা ক্যালকাটা কিলিংস' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

যেতে হতো। একদিন দেখলাম, গোরু কেটে যেমন ঝুলিয়ে রাখে তেমনি ভাবে হাত পা কাটা হিন্দু মেয়েদের চুল বেঁধে সব ঝুলিয়ে রেখেছে। সেই প্রথম আমি মেয়েদের খোলা উলঙ্গ দেখলাম''। (নিঃশব্দ সন্ত্রাস- রবীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৩৩)

দেবকুমার বসু তাঁর প্রবন্ধ '১৯৪৬ সালের দাঙ্গার কয়েকটা দিন' লিখেছেন— ''রাজাবাজারের সামনে ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ইস্কুল। মেয়েদের কলেজ ও হোস্টেল একদম ফাঁকা। সকলে পালিয়েছে। কেবল মাত্র রাস্তার দোতালার জানালায় চারটি মেয়েকে খুন করে রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে কে বা কারা—''। (নিঃশব্দ সন্ত্রাস- রবীন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৩৩)

তিনদিন ধরে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামক এই নৃশংস নারকীয় হিন্দুহত্যা চলেছিল। যা ছিল কাফেরদের (যারা ইসলাম বিশ্বাস করে না) বিরুদ্ধে ইসলামিক 'জিহাদ'। জিহাদিদের মুখে স্লোগান ছিল— 'আল্ল-হু-আকবর' 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' 'মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান' 'শালা হিন্দু লোগোকো মার ডাল' ইত্যাদি।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ। তাকে ঘিরে শকুনের ভিড়। আর চারদিকে হিন্দু হত্যার উল্লাস। বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক Mr. Leonard Mosely তাঁর বই 'The Last Days of the British Raj' এ এই নারকীয় ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন— ''The filthy and dreadful slaughter changed the shape of India and the course of history. The corpses of men, women and children lay stinking in the gutters of Chowringhee until the only reliable garbage-collector of India 'the vultures' picked them clean''।

প্রায় ৫ হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছিল মুসলমান জিহাদিরা এবং প্রায় ১৫ হাজারের মতো আহত হয়েছিল, হিন্দুদের অসংখ্য ঘরবাড়ি দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ধুলোয় মিশে গিয়েছিল নারীর সম্ভ্রম। সবাই যখন নিন্দায় মুখর, তখন জাতির পিতা অহিংসার পূজারি গান্ধীজী কী বলেছিলেন? ২৮ আগস্ট ১৯৪৬, তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন— ''এখন আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়''। জাতির পিতা গান্ধীজী হিন্দুদের লাঞ্ছনায় এবং মুসলমানদের অপকর্মে সবসময় নীরব থেকেছেন। এভাবেই তিনি হিন্দুদের মন-সাগর দলিত মথিত করে তার অহিংসার তরী বেয়ে গেছেন; কিন্তু মুসলমান-সাগরে তাঁর অহিংসার তরী বাইবার সাহস দেখাননি ভরাডুবির ভয়ে।

তথ্য সূত্র :

১. The Life and Times of Dr. Syama Prosad Mookerjee A complete Biography-by Tathagata Roy. ২. 1946 The Great Calcutta Killings And Noakhali Genocide–by Dr. Dinesh Ch. Sinha, Asoke Dasgupta, Ashish Chowdhury. ৩. বাঙালির পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ— ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ। ৪. নিঃশব্দ সন্ত্রাস— রবীন্দ্রনাথ দত্ত। ৫. ভারত বিভাজন, যোগেন্দ্রনাথ ও ড. আম্বেদকর— বিপদভঞ্জন বিশ্বাস।

পাহাড়কাটা ভাস্কর্যে

অনুপম ঊনকোটি

নীলাঞ্জনা রায়

বহুদিনের ইচ্ছে ছিল জায়গাটা একবার ঘুরে আসার। সেই মতো আগরতলা থেকে কাজের ফাঁকে একদিনের সময় বার করে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। গন্তব্য ঊনকোটি— আগরতলা থেকে দূরত্ব প্রায় ১৭৮ কিলোমিটার। ঊনকোটি যাবার দুটি পথ আছে, জানালেন গাড়ির চালক। প্রথমটি আমপাশা, কুমারঘাট হয়ে। এই পথের দূরত্ব কুড়ি কিলোমিটার বেশি। দ্বিতীয় পথটি ঘোরাই কমলপুর, মানিক ভাণ্ডারের বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতিকে উপভোগ করার লোভে এই পথটিই বেছে নিলাম।

গাড়ি চলেছে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে। গ্রামগুলি পরিচ্ছন্ন, বেশির ভাগ বাড়ির ছাদ টিনের। প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনায় সবুজের সমারোহ। সমস্ত পথের অনেক জায়গাতেই রাস্তা সরু এবং পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। ঊনকোটি যাবার পথে পড়ে অগণিত পাহাড়ি বাঁক। গাড়ির চালক দক্ষ হাতে রাস্তার চড়াই-উতরাই সামলান আর আমি অবাক হয়ে দেখি কলাগাছের অরণ্য। পাহাড়ের ঢালে বড় বড় পাতা-সহ অজস্র কলা গাছ। কিছু কিছু গাছ আবার ভেঙে পড়েছে কোনও অজানা কারণে, তবে দেখলে মনে হবে বোধহয় হস্তীযূথ পদদলিত করেছে।

গাড়ি থামল, এসে গেলাম গন্তব্যে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই চমক ভাঙল। পাথুরে পাহাড়ের গায়ে বিশাল মুখাবয়ব। দুই কানে কুন্তল, মাথায় মুকুট, আয়ত দুটি চোখ। দৃষ্টিকে বিস্তৃত করতেই দেখতে পেলাম আরও আরও এমন বিশালকায় ভাস্কর্য। কোথাও মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা, কোথাও কার্তিক, আবার কোথাও গণেশ। একটি বৃহৎ বৃষের পিঠের ওপরের ঝালর দেওয়া বসার আসনটি বহুযুগের ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা করে আজও রয়েছে।

পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা বিশালতার মাঝে কেমন করে এই ভাস্কর্যের সৃষ্টি হলো, সে এক কাহিনি। শিবঠাকুর-সহ এক কোটি দেবতা যাচ্ছিলেন বারাণসী। পথে রাত নামল, বিশ্রাম নিলেন সকলে। ভোর হলো, শিবঠাকুর উঠলেন, কিন্তু অন্য দেবতাদের সুখনিদ্রা ভাঙল না। শিবঠাকুর রাগ করে সেই ঊনকোটি অর্থাৎ কোটির এক কম সংখ্যক দেবতাকে নিদ্রামগ্ন রেখে একাই চলে গেলেন। পাহাড়ের গায়ে আজও দেবতারা তাই নিশ্চল।

ঊনকোটির পরিবেশ এক কথায় রোমাঞ্চকর। চারিদিকে

উঁচু পাহাড়ের প্রাচীরের মাঝে অপরাহ্ন বেলার সূর্যালোকও যেন কিছু স্তিমিত। ধাপে ধাপে বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে। মূর্তিগুলির আরও কাছে যাবার আগ্রহে নামতে নামতে ভাবি প্রচলিত কাহিনি যাইহোক পুরাতত্ত্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী এই ঊনকোটিতে একটি মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অনুমেয় এই অঞ্চলে পাল রাজাদের রাজত্বকালে শৈব মতাদর্শ প্রাধান্য পায় এবং প্রস্তর ঘোদিত একমুখ, চতুর্মুখ লিঙ্গ, উমামহেশ্বর, মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ ইত্যাদির মধ্যে শৈব প্রভাব সুস্পষ্ট।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট এই ভাস্কর্যগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতা নেই, গঠনশৈলীতে আছে বিশালতা আর কাঠিন্য। পাথরের গায়ে খোদাই মুখাবয়বটি সম্ভবত ভারতের বৃহত্তম পর্বতগাত্র ভাস্কর্য।

উমা-মহেশ্বর, মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তির অলঙ্করণ দেখে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয় যে কঠিন পাথর কেটে এত বিশাল মূর্তি তৈরি সেকালের বনবাসী মানুষদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। নিজেদের বিশ্বাস আর কল্পনা মিশিয়ে প্রকৃতির রাজ্যে বিস্ময়কর শিল্পের একমাত্র স্রষ্টা তারাই।

সন্ধ্যা নামার আগেই ফিরতে হবে। পথশ্রমের ধকল বাঁচাতে ঊনকোটির নিকটবর্তী কৈলাশহর ট্যুরিস্ট লজে রাত্রিবাসের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ফেরার পথে পা বাড়াই।

নবাগত একটি পর্যটক দলের কণ্ঠস্বরে মুখরিত হলো বনাঞ্চল। কিন্তু না, কোনও কণ্ঠস্বরই দেবতাদের ঘুম ভাঙাতে পারবে না, কারণ শিবঠাকুরের অভিশাপে তাঁরা এখানে ঘুমিয়ে আছেন, থাকবেন।

কীভাবে যাবেন

আগে ত্রিপুরায় বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলে শুধু যাতায়াতের সমস্যার কথা ভেবে পিছিয়ে আসতে হতো। কিন্তু এখন যে সমস্যা নেই। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা এখন ভারতের রেল, বিমান এবং সড়ক পরিবহণের মানচিত্রে উজ্জ্বলভাবে অবস্থান করেছে। কলকাতার শিয়ালদা থেকেই দুটি ট্রেন ছাড়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেস। যে-কোনও একটি চড়ে আপনি অনায়াসে আগরতলা পৌঁছে যেতে পারেন। ওখান থেকে বাসে ট্যাক্সিতে বা প্রাইভেট গাড়িতে ঊনকোটি। যারা একটু আরামে যেতে চান তাদের জন্য রয়েছে বিমানে যাবার ব্যবস্থা। কলকাতা থেকে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের বিমান নিয়মিত আগরতলা যায়। সময় লাগে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। খরচও খুব বেশি নয়।

কোথায় থাকবেন

সাধারণভাবে পর্যটকরা আগরতলা থেকে ঊনকোটি শিবমন্দির দেখতে যান। আগরতলায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকার জন্য রয়েছে গীতাঞ্জলি টুরিজম্ গেস্ট হাউস। ঠিকানা— কুঞ্জবন, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল গেস্ট হাউসটিতে থাকলে খরচ একটু বেশি পড়বে। কম খরচে থাকার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি হোটেল। যেমন হোটেল কল্পতরু ইন, জিঞ্জার হোটেল, হোটেল সোনার তরী, হোটেল সোমরাজ রিজেন্সি ইত্যাদি। হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে ত্রিপুরায় বেড়ানো সংক্রান্ত যে-কোনও সমস্যায় ট্যুরিস্ট গাইডদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ট্যুরিস্ট গাইডদের বিশদ বিবরণ পাবেন ত্রিপুরা ট্যুরিজমের ওয়েবসাইটে।

ত্রিপুরা টুরিজমের প্যাকেজড ট্যুর

ত্রিপুরার পর্যটন দপ্তর বেশ কয়েকটি প্যাকেজড ট্যুর পরিচালনা করে। যার মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

১। ডিসকভার ত্রিপুরা (৮ দিন/৭ রাত্রি), ২। গোল্ডেন ত্রিপুরা (৪ দিন/৩ রাত্রি), ৩। গ্রিন ত্রিপুরা (৬ দিন/৫ রাত্রি), ৪। বুদ্ধিস্ট সার্কিট (৩ দিন/২ রাত্রি), ৫। উইক এন্ড প্যাকেজ ট্যুর (৩ দিন/২ রাত্রি), ৬। ইকো-ট্যুরিজম প্যাকেজ (৪ দিন/৩ রাত্রি), ৭। মৈত্রী ভ্রমণ (৪ দিন/৪ রাত্রি)। এইসব প্যাকেজড ট্যুরের বিশদ বিবরণ পর্যটন দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এই সময়

মোদীকে খুনের ছক

গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করার ছক কষেছিল আই এস আই এসের দুই জঙ্গি।

সুরাটে ধৃত দুই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই তথ্য মিলেছে বলে দাবি গুজরাট সন্ত্রাস দমন শাখার। চার্জশিট গঠন করা হয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে।

জঙ্গির আবেদন

একজন সন্ত্রাসবাদীরও বোধোদয় হতে পারে।

তার প্রমাণ লস্কর-ই-তৈবার আইজাস আহমেদ গরজি। কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় সে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হলেও ভারতীয় সেনার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। সে চায় পাকিস্তানের সব জঙ্গি সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে যে যার ঘরে ফিরে যাক।

দিল্লি চলো

যারা বড় স্বপ্ন দেখেন তাদের জন্য দারুণ একটা সুযোগ এনে দিয়েছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। আপনি

যদি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি, এম ফিল করতে চান, কিংবা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা করতে চান, অনায়াসে করতে পারেন। নতুন নিয়মানুযায়ী, ভর্তি থেকে পঠন-পাঠন—সবই হবে অনলাইনে।

সমাবেশ -সমাচার

চিত্রভারতী কলকাতা শাখার বিশেষ অনুষ্ঠান

গত ২ মে বরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে আশুতোষ শতবার্ষিকী প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চিত্রভারতী। মূলত স্বল্পদৈর্ঘের অর্থবহ ছায়াছবির নির্মাণ ও প্রসারই চিত্রভারতীর লক্ষ্য। কলকাতায় গত বছর ছোটো ছবির একটি সফল প্রতিযোগিতা আয়োজনের পর এ বছর অক্টোবর মাস অবধি প্রতিযোগিতার ছবি গ্রহণের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা ও সমাজকর্মী ভিক্টর ব্যানার্জি। ভারতমাতা ও সত্যজিৎ রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রী ব্যানার্জি ও বিশেষ অতিথি চিত্র পরিচালক গৌতম বসু ও আদিনাথ দাস। একই সঙ্গে এদিন চিত্রভারতী কলকাতার web channel ও virtual chatroom-এর উদ্বোধন করেন শ্রী ব্যানার্জি। এর ফলে চলচ্চিত্রপ্রেমী ও সম্ভাব্য নির্মাতারা পারস্পরিক মত বিনিময় করতে পারবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে তিনটি 'ম্যায় অন্ধা হু', 'তিতান' ও 'নীরব শিক্ষা' (স্বচ্ছ ভারতকেন্দ্রিক) ছোটো ছবি প্রদর্শিত হয়। শ্রীব্যানার্জি তাঁর ভাষণে ভারতীয় চলচ্চিত্রে মার্কিনি প্রভাবের অনুপ্রবেশে খেদ ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের সংস্কৃতিকে যে-কোনও মূল্যে সংরক্ষণ করতে হবে, না হলে বিশ্ব সংস্কৃতিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মরণ

গত ২ মে কলকাতার শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে পুস্তকালয়ের সভাগৃহে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তথা উত্তরপ্রদেশের পূর্বতন রাজ্যপাল স্বর্গীয় আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর ৮৯তম জন্মদিন শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হিন্দি সাহিত্য জগতের প্রখ্যাত সমালোচক তথা সাহিত্যিক শ্রীনিবাস শর্মা। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ওমপ্রকাশ মিশ্র আচার্য শাস্ত্রীজীর রচিত 'তুমকো ক্যা জাদু আতা হ্যায়' গীত পরিবেশন করেন। ড. ঋষিকেশ শর্মা, ড. বসুমতী ডাগা, আনন্দ পাণ্ডে, শিবনাথ পাণ্ডে, অজয়েন্দ্র ত্রিবেদী, কমলেশ মিশ্র, বিধুশেখর শাস্ত্রী, দীনেশ

এই সময়

চীনে ভারত

কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নির্মলা সীতারামন চীনে ঘুরে এসেছেন। উদ্দেশ্য, দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি। সম্প্রতি ইউহানের সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পর্যটন মন্ত্রীদের সমাবেশে অংশ নিতে চীনে গিয়েছিলেন ভারতের পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কে. জে. অ্যালফনস।

সিয়াচেনে রাষ্ট্রপতি

চোদ্দ বছর পর ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতি সিয়াচেনে পা রাখলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি

রামনাথ কোবিন্দ সিয়াচেনে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাদের বেস ক্যাম্প পরিদর্শনে যান। প্রতিকূল পরিবেশে কর্মরত সেনার মনোবল বাড়ানোই এই সফরের উদ্দেশ্য।

হংকংয়ে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

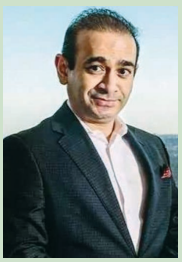

ভারতের ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া হংকংয়ের আদালতে নীরব মোদীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি জাল কাগজপত্র দাখিল করে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। সেই ঋণ শোধ না করে গা-ঢাকা দিয়েছেন। হংকংয়ে নীরবের প্রায় ৬.২৫ মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি রয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

পাণ্ডে, অর্চনা পাণ্ডে প্রমুখ তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে শাস্ত্রীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু গণ্যমান্য সাহিত্যপ্রেমী ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বংশীধর শর্মা।

রাজস্থান পরিষদের রাজস্থান দিবস সমারোহ

গত ১ এপ্রিল কলকাতার অসোয়াল ভবনে রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে রাজস্থান দিবস সমারোহের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী শেখাওয়াত অনুষ্ঠানে 'গর্বিলো রাজস্থান' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন। প্রধান বক্তা রূপে রাজস্থান সরকারের

মন্ত্রী জনাব ইউনুস খান এবং বিশিষ্ট অতিথি রূপে অখিল ভারতবর্ষীয় মাহেশ্বরী মহাসভার মহামন্ত্রী সন্দীপ কাবরা। সমারোহে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু প্রবাসী রাজস্থানী ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। সমারোহ পরিচালনা করেন বংশীধর শর্মা।

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের কার্যকর্তা অভ্যাসবর্গ

গত ৩১ মার্চ এবং ১ এপ্রিল বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দু'দিনের কার্যকর্তাদের অভ্যাসবর্গ শুরু হয়। এই বর্গে জেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ৩৫ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বর্গে পুরো সময় উপস্থিত থেকে পথনির্দেশ করেন প্রজ্ঞাপ্রবাহ পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক অরবিন্দ দাশ, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ সরকার, প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা, ভাণ্ডারডিহি তপোবন আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী সোমনাথ ব্রহ্মচারী, অগ্রদীপ কপিলমুনি আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ ও স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উদ্যোগপতি ননিগোপাল সিংহ। বর্গের পুরো ব্যবস্থার

এই সময়

নেপালে নরেন্দ্র মোদী

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও শক্তিশালী

করার কথা নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বলে আসছেন। সম্প্রতি তিনি এই কারণেই নেপালে যান। তাঁকে আমন্ত্রণ জানান নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে. পি. শর্মা অলি।

ভাবনা বিজেপিতে

দক্ষিণী সিনেমায় অভিনেত্রী ভাবনা রামান্নার নাম অনেকেই জানেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা। কিন্তু সম্প্রতি তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতাদের আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ। তাই তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

সুষমার শিক্ষা

শেখ আতিক নামে এক ব্যক্তি সাহায্য চেয়ে বিদেশমন্ত্রীকে টুইট করেন। তিনি বিদেশে চিকিৎসা করাতে চান কিন্তু পাসপোর্টটি খারাপ হয়ে যায় তাই সাহায্য চাই। সুষমা তার টুইটার প্রোফাইল পরীক্ষা করে হতবাক। তাই লিখলেন, 'আপনি যদি জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দা হন তাহলে সাহায্য পাবেন। কিন্তু আপনি লিখেছেন, আপনি ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের লোক। দুঃখিত, ওই নামে ভারতে কোনও রাজ্য নেই।

সমাবেশ -সমাচার

দায়িত্বে ছিলেন কৌশিক দাশগুপ্ত। বগে উপস্থিত কার্যকর্তারা দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলার গরিব হিন্দুদের ধর্মান্তকরণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেন এবং তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে বিষয়ে চর্চা ও পথনির্দেশ করেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য আগ্রহ করা হয়। বর্গে উপস্থিত কার্যকর্তারা দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজেদের এলাকায় ধর্মজাগরণের কাজ করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন।

শৈবভারতী পত্রিকার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

গত ২২ এপ্রিল কলকাতার বাংলা আকাডেমির সভাগরে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শৈবভারতী পত্রিকার বার্ষিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। আজীবন সাহিত্যকৃতির জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট কবি ও কলকাতা

হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুধেন্দু মল্লিক। ভারততত্ত্ব ও নাথ কৃষ্টিতে ড. অতুলচন্দ্র ভৌমিক, প্রবন্ধ সাহিত্যে ড. কৃষ্ণা ভৌমিক, কবিতায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কথা সাহিত্যে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও শিশু সাহিত্যে সিদ্ধার্থ সিংহ পুরস্কৃত হন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শেখর বসু, কবি গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন অধ্যক্ষা গার্গী নাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শৈবভারতী পুরস্কার কলকাতা কালীঘাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সেবাইত সাধক চৌরঙ্গী নাথের নামাঙ্কিত। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যের মাধ্যমে নাথ সাহিত্য ও কৃষ্টির অবদান উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরে প্রায় ৩২ জন নবীন ও প্রবীণ কবির সমাগমে সভাঘর মুখরিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিয়ালী মুখার্জি।

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের নব প্রকল্পের উদ্বোধন

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের সেবা সংস্থা বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদ তিনটি নতুন সেবা প্রকল্প সেবাভবন ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে শুরু করে। বনবাসী গ্রাম হাড়িফেলা সেবা ভবন থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে। প্রায় ১৫০ পরিবারের গ্রাম। পুরুষেরা দিনমজুর আর মহিলারা সারাদিন জঙ্গলমহলে কাঠ-পাতা কুড়িয়ে দিন যাপন করে। শিশুরা শিক্ষাকেন্দ্রে যায় কিন্তু পড়াশুনা তাদের অভ্যাসের মধ্যে পড়ে না। এরকমই একটি স্থানে সেবা বিভাগের উদ্যোগে শিশু সংস্কার কেন্দ্র শুরু হয় গত ১২ এপ্রিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের দিদিভাই সুখী ওঁরাও দায়িত্ব নিয়েছেন। ২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বিপুল উৎসাহে চলছে কেন্দ্র। সেবা কেন্দ্রে যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয় গত ৯ মার্চ। পতঞ্জলি যোগ পীঠের সহযোগিতায় ইছাপুর সেবা কেন্দ্রে এই যোগপ্রশিক্ষণ চলছে। এই অঞ্চলে এই প্রথম যোগ কেন্দ্র শুরু হলো। যুবক-যুবতীদের চাকরির পরীক্ষায় উপযুক্ত করে তোলার জন্য শুরু করে গত ২৪ মার্চ কেশব পাঠচক্র শুরু হয়েছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে দক্ষ শিক্ষকরা এগিয়ে এসেছেন। বর্তমানে ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে।

ত্রিপুরার পৌরাণিক ইতিহাস

ত্রিপুরাতক

সৌরিশ দেববর্মন

ত্রিপুরা একটি ছোট্ট রাজ্য হলেও এর ইতিহাস সুপ্রাচীন। পৌরাণিক যুগে ত্রিপুরার নাম ছিল কিরাতদেশ। মহাভারতের যুগে এই কিরাতদেশ ছিল সমুদ্রোপকূলবর্তী। বিষ্ণুপুরাণ, মার্কন্ডেয় পুরাণ ও মহাভারতের সভাপর্বে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে কিরাতদেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ও রাজরাজেশ্বরীতন্ত্রও উপরিউক্ত মতেরই সমর্থন করেছে।

ত্রিপুরার রাজবংশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংস্কৃত 'রাজরত্নাকরম' ও সংস্কৃত ও বাংলা 'রাজমালা' যা চোদ্দশো শতকে রচিত, সেখানেও বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলকে কিরাতদেশ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায় যে তিতিক্ষুর পুত্র বালী এবং বালীর পাঁচ পুত্র হলো— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ক্ষ্মুণ্য ও পৌন্ড্র এবং এদের থেকে পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্যের নামকরণ হয়। ত্রিপুরা ক্ষ্মুণ্যের নামাঙ্কিত প্রদেশে বর্তমান। ত্রিপুরা রাজবংশ হলো চন্দ্রবংশতাবংশ সম্ভূত। চন্দ্রবংশের ষষ্ঠতম রাজা ছিলেন যযাতি। প্রতিষ্ঠানপুর ছিল যযাতির রাজধানী যা বর্তমান প্রয়াগ বা এলাহাবাদ শহর।

মহাভারত অনুযায়ী যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং মহারানির দাসীরূপে দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র— যদু ও তুর্বসুর জন্ম হয়। শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র যথাক্রমে— দ্রুহ্য, অনু ও পুরুর জন্ম হয়। অবৈধভাবে শর্মিষ্ঠার

গর্ভে পুত্রের জন্ম হওয়ায় শুক্রাচার্য যযাতিকে জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দেন। তখন যযাতি সকল পুত্রকে ডেকে তার জরাব্যাধি গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে একমাত্র পুরু ব্যতীত সকলেই অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে পুরু ছাড়া সব পুত্রকেই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন যযাতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ার জন্য তখন যযাতি নন্দনেরা ছড়িয়ে পড়েন।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অনুসারে দ্রুহ্যকে প্রতিষ্ঠানপুর থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন যযাতি। পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে দ্রুহ্য যখন সাগরসঙ্গমে উপস্থিত তখন তিনি সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিলমুনির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। কপিলমুনির নির্দেশে দ্রুহ্য সাগরদ্বীপে (সুন্দরবন অঞ্চলে) ত্রিবেগ নগরী স্থাপন করেন। রাজমালার বংশপঞ্জী অনুসারে চন্দ্রের অধস্তন বত্রিশতম রাজা প্রতর্দন কিরাত দেশ জয় করেন এবং অসমের নওগাঁও অঞ্চলে অবস্থিত কপিলি নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাচীন ত্রিবেগ রাজ্যের যা দ্বিতীয় ত্রিবেগ নামেও খ্যাত তার প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রিক পর্যটক টলেমি কিরাতদেশের যে বর্ণনা করেছেন তা ব্রহ্মপুত্র নদের মুখ থেকে বর্তমান ত্রিপুরা হয়ে আরাকান নদীর মুখে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিবরণে রাজমালার লিপিবদ্ধ ইতিহাসের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ত্রিপুরা নামের উৎস নিয়ে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন অনেক মত প্রচলিত আছে। ত্রিপুর তথা দ্রুহ্য বংশের চুয়াল্লিশতম রাজা দৈত্য ও চেদীশ্বর দুহিতা মাণ্ডবীর পুত্র ছিলেন ত্রিপুর। অনেকের মতে ত্রিপুর থেকেই ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। কিন্তু এই মতবাদ রাজবংশের সংস্কৃত গ্রন্থ 'রাজরত্নাকরম্' নস্যাৎ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে জন্মহেতু

প্রাচীন চৈত্যগৃহের ধ্বংসাবশেষ।

মুরগির লড়াই দেখার রংঘর।

রাজপুত্রের নাম ত্রিপুর রাখা হয়েছে। এই ত্রিপুর ছিলেন অত্যন্ত অনাচারী ও ধর্মদ্বেষী রাজা। যখন ত্রিপুরের অত্যাচারে রাজ্যের প্রজাসকল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তখন সকলে ত্রিপুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। মহাদেব প্রজাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হলেন এবং ত্রিপুরকে বধ করলেন। অনেকের মতে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী নামানুসারে ত্রিপুরা নামটি প্রচলিত হয়েছে।

মহারাজ প্রতর্দনের পৌত্র কলিন্দ প্রাচীন ত্রিবেগ অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভাগীরথীর তীরে ছত্রভোগ নামক গ্রামের এক মন্দিরে বিগ্রহের পূজা হতো। অনেকে মনে করেন সতীর বক্ষস্থল এখানে পতিত হয়েছিল। এই তীর্থস্থানের কথা কবিকঙ্কন চণ্ডী ও চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে। কৈলাশচন্দ্র সিংহের মতে ত্রিপুরী ভাষার জলবাচক শব্দ 'তৌয়' এবং জলের নিকট অর্থে 'প্রা' শব্দের যোগে 'তৌয়প্রা' সৃষ্টি হয়েছে এবং তৌয়প্রা থেকেই ত্রিপুরা শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বটি অনুপযুক্ত কারণ 'প্রা' নিকট নয়, ভাগ হয়ে যাওয়া। অনেকের মতে 'ত্রিপুরাতন্ত্র' থেকে ত্রিপুরা শব্দটির উৎপত্তি। শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই তিন তন্ত্রের সমন্বিত সাধনার প্রণালীই হলো ত্রিপুরতন্ত্র। 'পরশুরাম কল্পসূত্র' থেকে ত্রিপুরাতন্ত্র সম্পর্কে জানা যায়। তান্ত্রিক আচার অভিচার আবহমানকাল থেকেই ত্রিপুরী জাতির ধর্মাচরণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ত্রিপুরাতন্ত্রের প্রভাবের ফলে এই রাজ্যে শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল। মহাভারতের সভাপর্ব, বনপর্ব ও ভীষ্মপর্বে ত্রিপুরার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তের অধীনে দীনা কিরাত মেকল অর্থাৎ মণিপুরের সঙ্গে ত্রিপুরার নাম নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্ণের দিগ্বিজয়ে পূর্বাভিমুখে রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা নাম আছে। এর থেকেই প্রমাণিত যে ত্রিপুরা কত প্রাচীন। রাজা ত্রিপুরের পুত্র ত্রিলোচন পৌরাণিক যুগে ত্রিপুরা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে বিবেচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সুখ্যাতি শুনে ত্রিলোচনকে ইন্দ্রপ্রস্থে আপায়িত করেছিলেন এবং উপহার হিসেবে হস্তী দন্ত নির্মিত একটি সিংহাসন এবং শ্বেতছত্র প্রদান করেন। লোকবিশ্বাস সেই সিংহাসনই ত্রিপুর সিংহাসন যা এখনও উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে সংরক্ষিত। ত্রিলোচন ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা চতুর্দশ দেবতা পূজার প্রবর্তক। স্বয়ং মহাদেব ত্রিলোচনকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে তিনি পূজা গ্রহণ করতে স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। চতুর্দশ দেবতারা হলেন— হর, উমা, হরি, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি। শিবের কথায় সকল দেবতা পূজা গ্রহণের জন্য উপস্থিত তখন একমাত্র হরি বা নারায়ণ আসেননি। দণ্ডীদের বিবেচনায় ত্রিলোচন ক্ষীরোদ সাগরের তীরে বীণাবাদন শুরু করলেন হরিকে তুষ্ট করতে। হরি তুষ্ট হয়ে চতুর্দশ দেবতা পূজা গ্রহণে সম্মত হলেন। ত্রিপুরার উত্তরে কৈলাসহর অঞ্চলে বিখ্যাত শৈবতীর্থ হলো ঊনকোটি অর্থাৎ এক কোটির চেয়ে এক কম। অনেকে ঊনকোটিকে পূর্বের বারাণসীও বলেন। রাজ্যের উপজাতিরা একে বলে 'সুব্রায় ঘুঙ' অর্থাৎ শিবের বাসস্থান। অনেকে একে কপিল তীর্থও বলে থাকে, কারণ পুরাকালে কপিলমুনি এখানে সাধনা করেছিলেন। এই তীর্থের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মনু নদী। পুরাকালে মনু ঋষি মনু নদীর তীরে ধ্যান করেছিলেন। লোকবিশ্বাস মনুর নামেই মনু নদী হয়েছে। বায়ুপুরাণে মনু নদীর নাম উল্লেখ আছে এবং মনু ও বরবক্র (বরাক) নদীর মধ্যাঞ্চলকে অত্যন্ত পবিত্র বলা হয়েছে।

পণ্ডিত শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর মতে প্রাচীনকালে ত্রিপুরার পর্বতের নাম ছিল রঘুনন্দন পর্বত। দুটি প্রাচীন নদী ত্রিপুরায় বহমান--- মনু ও গোমতী। সুতরাং সূর্যবংশীয়দের সঙ্গে ত্রিপুরার একটা সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে। কারণ তিনটি নামই সূর্যবংশীয়দিগের সঙ্গে সুপরিচিত। পীঠমালাতন্ত্র ও তন্ত্রচূড়ামণি ত্রিপুরার উল্লেখ করেছে সুস্পষ্টভাবে। গুহ্যতন্ত্রে ও কমাঘগ তন্ত্রে ত্রিপুরার উপস্থিতি বিদ্যমান। মহাঋষি বেদব্যাস ভবিষ্য পুরাণে ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

''বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্বম মণিপুরকম্।

লৌহিত্য স্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম।।''

পূর্বভারতের পৌরাণিক যুগের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরার উপস্থিতি সমুজ্জ্বল। সুতরাং একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ত্রিপুরা ভারতের পৌরাণিক যুগের অন্যতম নিদর্শন ও সনাতন সভ্যতার ধারক ও বাহক। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

জর্জেস ইফ্রা : (১৯৪৭-)

পরিচিতি : ফ্রান্সের গণিতবিদ্যার অন্যতম ইতিহাসকার। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকটি হলো, 'দ্য ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অব নাম্বার্স'।

উদ্ধৃতি : প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উচ্চতম শিল্পকলা ছিল সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণা। ইউরোপীয়দের তুলনায় অন্তত হাজার বছর আগেই ভারতীয় ঋষিরা জানতেন যে 'শূন্য' আর 'অনন্ত' সংখ্যা দু'টির স্থান হচ্ছে পরস্পরের ঠিক বিপরীত মেরুতে।

উদ্ধৃতি : সোজা কথায়, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছিল আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে। এর প্রমাণ হলো সংস্কৃত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি সংখ্যাতত্ত্বের ও সংখ্যাবিজ্ঞান বর্ণনাতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

উদ্ধৃতি : বৃহৎ সংখ্যার প্রতি হিন্দুদের আগ্রহ স্থানিক মান পদ্ধতির (একক, দশক, শতক প্রভৃতি) উদ্ভাবন করেছিল এবং তা তাদেরকে দৃশ্য জগৎ ছাড়িয়ে আরও উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তা তাদেরকে অসীমের আবিষ্কার করতেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

উৎস : 'দ্য ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অব নাম্বার্স'—জর্জেস ইফ্রা।

হেইনরিখ জিমার : (১৮৯০-১৯৪৩)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির বিখ্যাত গবেষক ও ভারততত্ত্ববিদ। হাইডেল্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন বহুদিন। তিনিই বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কার্ল জুংকে প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

উদ্ধৃতি : আধুনিক কালে আমাদের পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা যে সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে, খ্রিস্টজন্মের ৭০০ বৎসর পূর্বেই ভারতের মহান ঋষিরা সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়াতেন। এজন্যই আমরা একাধারে বিরক্ত এবং উত্তেজিত হই, যুগপৎ ভাবে অস্বচ্ছন্দ বোধ করি আবার উৎসাহিতও হই যখন প্রাচ্য ধ্যানধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে পড়ি।

উৎস : দ্য সার্চ অব্ দ্য ক্র্যাড্‌ল অব সিভিলাইজেশন-নিউ লাইট অন অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া— জর্জ ফুয়েরস্টেইন—সুভাষ কাক এবং ডেভিড ফ্রলে।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় সভ্যতার সমগ্র ইমারতটাই অধ্যাত্মিক রসে সিক্ত।

উৎস : ফিলোজফিস অব ইন্ডিয়া—হেইন্‌রিখ জিমার।

কাউন্ট ম্যাগ্‌নাস ফার্ডিনান্ড জর্নস্টের্না : (১৭৭৯-১৮৪৭)

পরিচিতি : ইনি সুইডেন জাত প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং লন্ডনে মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকটি হলো, 'দ্য থিওরি অব হিন্দুজ উইথ দেয়ার সিস্টেম অব ফিলোসফি অ্যান্ড কসমোগনি'।

উদ্ধৃতি : এইসব মহান ধ্যানধারণা থেকে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে বেদে বর্ণিত একমাত্র পরমেশ্বরই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। অসীম, অনন্ত, শাশ্বত, সর্বব্যাপী জ্যোতিস্বরূপ এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।

উৎস : দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন দ্য ইস্ট— ম্যাগ্‌নাস ফার্ডিনান্ড জর্নস্টের্না, হানিবল এভান্‌স লইয়েড।

কার্ল. জি. জুং : (১৮৭৫-১৯৬১)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুইস্ মনোবিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন এক প্রভাবশালী চিন্তাবিদ এবং বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ। তাঁর বিশেষ অবদানটি হলো, 'জুঙ্গিয়ান মনোবিদ্যার' সৃষ্টি। তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন, কিমিয়া বিদ্যা এবং কলা ও সাহিত্যের গবেষক ছিলেন।

উদ্ধৃতি : যখন আমরা উপনিষদের বাণী ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মায় যে উপনিষদের এই উপলব্ধি কোনও সহজ কর্ম নয়। পাশ্চাত্যের ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরীভাব প্রাচ্যের অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার কাছে মনে হয় যেন বর্বরতা। তাদের জ্ঞানের এই অসামান্য গভীরতা এবং মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক পরিপূর্ণতার সামান্যতম আভাসও পাওয়া যায় না পাশ্চাত্য দর্শনের ধ্যানধারণায়।

উৎস : সাইকোলজিক্যাল টাইপ—কার্ল জুং।

উদ্ধৃতি : হিন্দু এবং চীনাদের মহান ও কালজয়ী সভ্যতার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত এবং বিকশিত হয়েছিল তাদের আত্মজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এবং তা তাদের দৈনন্দিন জীবন এবং দর্শনকে এক উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিল।

উৎস : হিন্দু কালচার—কে. গুরু. দত্ত।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

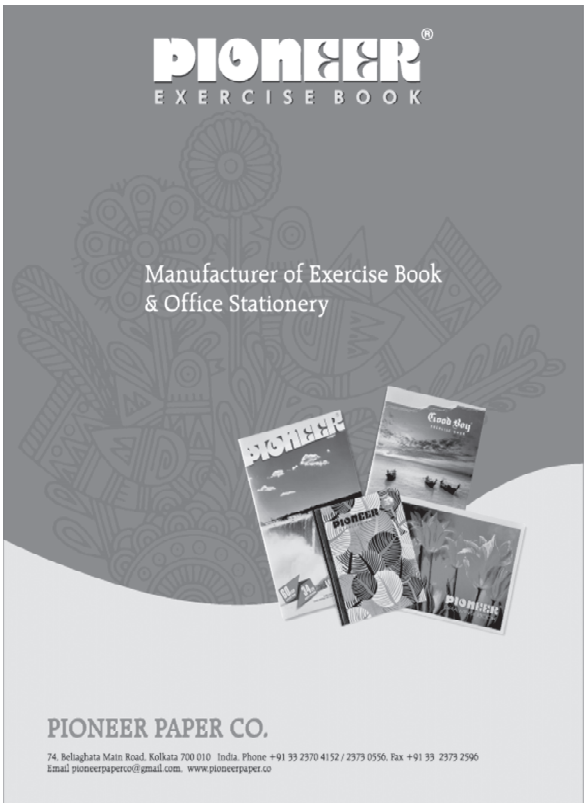

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

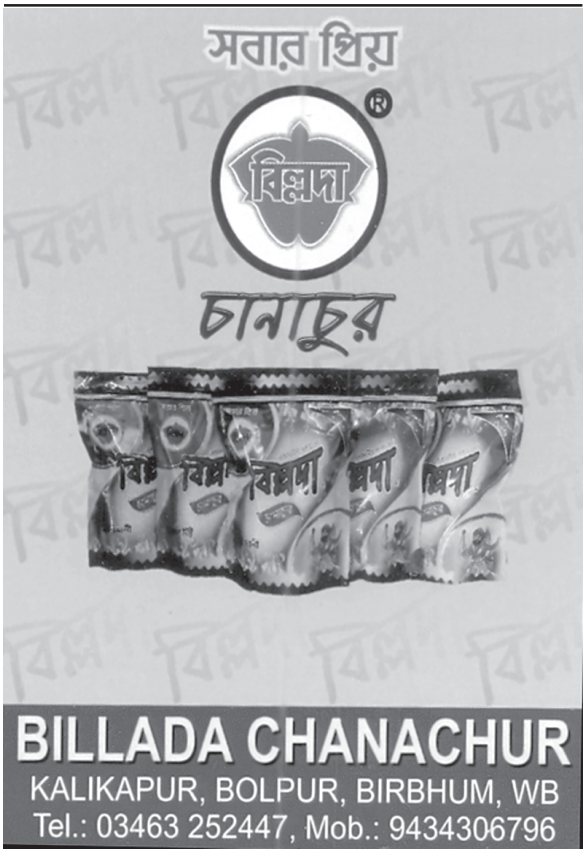

প্রতিহিংসা

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ বাড়িতে একাই আছি। এখন আকাশের গায়ে হাত-পা ছড়ানো বিকেল। শীতল বিকেলে ঘরে বসে, টিভিতে একটা থ্রিলার দেখছি। বাস্তবিক, থ্রিলার আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। দেখতে দেখতে অচিরেই বুঁদ হয়ে যাই। বিজ্ঞাপনের সময় অবশ্য মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে। ব্রেকের ঠিক আগের মুহূর্তে এমন একটা কৌতূহল তৈরি করে যে আমার স্নায়ু টগবগ করে ফুটতে থাকে। অমনি বিজ্ঞাপন! যেমন এখন বিজাপন দেখাচ্ছে। যদিও জানি, ব্রেকের মুহূর্তগুলোর প্রয়োজনে কফি বানানো, টুকটাক কাজ বা কথা বলা, এমনকী টয়লেটেও যাওয়া যায়। আমি আবার থ্রিলার শুরু হলে সাধারণত মোবাইল অফ করে দিই। ফের বিরতিতে অন্ করে যা দেখার দেখে নিই। আজ বেশ জবর শীত পড়েছে। ফ্লাস্ক থেকে ৩-৪ বার কফি ঢেলে খাচ্ছি। মনটাও যথেষ্ট ফুরফুরে। থ্রিলার শুরু হলো—

শেষ বিকেলের মরা আলোয় লঞ্চঘাটে ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এসেছে। জেটি থেকে একদঙ্গল নারী-পুরুষ পাড়ে নামছে। তাদের মাঝে নীল জিনসের ট্রাউজারের ওপর কালো লেদারের জ্যাকেট পরা একজনকে দেখা গেল। মাথায় কালো টুপি। কাঁধে ছোট লেদারের ব্যাগ। প্রায় ৬ ফুট লম্বা, তামাটে পেটানো চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো, দৃষ্টি যেন হিংস্র।

লোকটা লঞ্চঘাটের পাশে, একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। নিরালায় দাঁড়িয়ে সে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। নদীর ওপারে বিলীয়মান সূর্য লাল গোলাকার। এপারে পারিপার্শ্বিক ছায়াময়। যাত্রীরা ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে; চলাফেরা করছে। লোকটা ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটা দিল। ডান দিকে মালগাড়ির সিঙ্গল লাইন, দু-পাশে ৭-৮ ফুট উঁচু পাঁচিল একটানা চলে গেছে দুই দিকে। ওদিকের পাঁচিলের ওধারে সারি সারি লালচে বা মেটে তিনতলা-চারতলা সরকারি গুদাম। নদীর পাড় কোথাও ফাঁকা, কোথাও ছোটো ছোটো চা-পান-সিগারেটের দোকান। সামনে চার-পাঁচজনের জটলা। কোনওখানে ভাঙা ভাঙা ঘাটে গাছপালার আড়ালে জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতী ও দুটো-একটা ভবঘুরে বসে আছে। কোনও আঘাটায় মদের আসর বসেছে; ঝোপঝাড়ের আড়ালে গাঁজার ঠেক।

নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা আরেকটা ঘাটের সামনে এল। চারদিক ধূসর; আশপাশে কুয়াশা ঝুলছে। সে জ্যাকেটের পকেট থেকে মোবাইল বের করে টাইম দেখল।

আমার ঘরের শার্সি জানলায় পিঠ ঘষছে বেগুনি কুয়াশা। ...ওহো, এতক্ষণে চিনতে পেরেছি। এই লোকটাই তো খুনি। এর আগে চারটে মার্ডার করেছে। ওর আশপাশে চেনাজানা মানুষদের মধ্যে যারা অন্যায় বা পাপ করেছে, তাদের ও যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। যদিও সেইসব পাপ ও অন্যায়ের সংজ্ঞার্থ, বিচার এবং প্রাণদণ্ড --- ওর ভাবনাচিন্তা-মূল্যবোধ-নীতি অনুসারে।

আগের চারটে ভিক্টিম— তিনজন পুরুষ ও এক মহিলা। খুনি প্রথমে হত্যা করেছিল বছর ৩৭-৩৮ বছরের এক পুরুষকে। সেই পুরুষের নাম অজয়, সে কিনা এক সময়ে খুনির বন্ধু ছিল। অজয় গর্ভবতী স্ত্রীকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। মেয়েটি মারা যায়। এব্যাপারে প্ররোচনা অথবা মন্ত্রণা দিয়েছিল অজয়ের বিধবা সৎমা। বলা বাহুল্য, মধ্যবয়স্কা সৎমার সঙ্গে অজয়ের গোপন প্রণয় ছিল। কিন্তু ওরা পুলিশের কাছে এই হত্যাকে দুর্ঘটনা বলে চালায়। কিছু প্রথাগত তদন্তের পর পুলিশও হাল ছেড়ে দেয়।

পরে এক বর্ষার রাতে খুনি বন্ধুর গলায় টেলিফোনের তার জড়িয়ে এবং তার সৎমাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে খতম করে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি খুনির খুড়তুতো ভাই দীপক। নিজের পাঁচ বছরের ছেলেকে চলন্ত ট্রেনের সামনে ছুঁড়ে ফেলেছিল দীপক, কারণ সে মনে করত, সন্তানের জন্মদাতা অন্য কেউ। ছেলেকে মেরে সে একটা ভয়ঙ্কর উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে।

স্বভাবতই খুনি এহেন নৃশংস ঘটনার বদলা নেয়, রাতের অন্ধকারে রেললাইনে হাত পা মুখ বেঁধে ভাইকে ফেলে রেখে। তারপর—

এমনকী খুনির মৃত্যুদণ্ড থেকে পরিত্রাণ পাননি তার বৃদ্ধ মামাও। খুনির মামা গোলকবিহারী যৌবনে শ্বশুরবাড়ির যাবতীয় সম্পত্তি হাতানোর লোভে খুন করেছিলেন তাঁর ১৮ বছরের শ্যালককে। ছেলেটা সাঁতার জানত না। গোলকবিহারী তাকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। গল্পের ছলে ঘাট থেকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ছেলেটাকে গভীর জলে ডুবিয়ে মারেন।

এইরকম নির্দয় হত্যাকাণ্ডের যথারীতি প্রতিশোধ নেয় খুনি। মামাকে ভরপেট মদ খাইয়ে নদীতে টেনে নিয়ে গিয়ে, মাত্র একগলা জলে মামার মাথাটা কিছুক্ষণ সবলে চুবিয়ে রাখে।

তবে এখন লোকটা কাকে খুন করতে আসছে, জানতে পারছি না। সন্ধ্যা ও রাতের সন্ধিক্ষণে সে নির্জন পাড় ধরে হাঁটছে। তার চোয়াল শক্ত, চোখ জ্বলছে প্রতিহিংসায়।

দেখতে দেখতে আমার গা ছমছম করে উঠল। তার চোখ হয়তো আমাকেই দেখছে। আমার মাথাটা ঘুরে গেল ঝট করে। পরক্ষণেই অবশ্য সামনে নিলাম। আমি তো টিভি দেখছি।

লোকটা এবার কালো চিতার মতো শরীরে মোচড় দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নদীর দিকে পিছন ফিরে কী যেন দেখে নিল। নদীপাড়ের রাস্তার দিকে রেললাইনের ধার বরাবর যে ভাঙাচোরা পাঁচিল রয়েছে, তার গায়ে গায়ে ছোট-বড় ফাটল বা ফাঁক আর ঝোপঝাড়। তুলনায় এপাশের একটানা পাঁচিলের মাঝে বড় ফাঁক একটাই দেখা যায়, ফাঁক দিয়ে সরু গলি চলে গেছে এঁকেবেঁকে। দুই পাশে পুরনো ঘরবাড়ি, কারখানা আর মালখানা। সন্ধে থেকে গলিটা একেবারে শুনশান হয়ে যায়।

লোকটা রাস্তা থেকে ঝোপঝাড় এড়িয়ে ফাটল দিয়ে লাইনের ওপরে উঠল। দুই দিক দেখল। লাইন পেরিয়ে এদিকের পাঁচিলের ফাটল দিয়ে গলিতে নামলো। তাকে দেখে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকল।

হঠাৎ টিভি বন্ধ হয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। লোড শেডিং? আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়! রগ দুটো দপদপ করছে। ... মাত্র কয়েক মিনিট— তারপরই আমার মনে পড়ল, লোকটা অসছে গলি ধরে। সে এখনই ডান দিকের গলিতে ঢুকবে। খেয়াল হতেই, আমি রীতিমতো চমকে উঠলাম। কেননা, দ্বিতীয় গলির দু-ধারে পরপর পুরোনো ঘরবাড়ির মাঝখানে বাঁ দিকের দোতলা বাড়িটা আমার।

এখন আমি কী করব? মেইন গেট তালাবন্ধ। দোতলার সিঁড়ির দরজাও তালা মারা। তবু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। লোকটা কিন্তু কাঁচা খেলোয়াড় নয়। ওর ব্যাগে তালা খোলার বা ভাঙার সরঞ্জাম থাকতে পারে। সুতরাং আমার এখন কী করা

উচিত? টর্চ জ্বালাব! এমারজেন্সি ল্যাম্প জ্বালব! ইনভার্টার জ্বালব!

... নাঃ, আলো দেখলে জানতে পারবে, আমি বাড়িতেই আছি।... আমি কি এখানেই বসে থাকব, নাকি কোথাও লুকিয়ে পড়ব। ... আচ্ছা, আমি এত ভয়ই বা পাচ্ছি কেন? ও আমাকে কেন মারবে? আমি কী এমন অপরাধ করেছি! কিছুই তো করিনি। তবু মনে করে দেখি—। আশ্চর্য, পুরো বাড়িটাই আচমকা অন্ধকার হয়ে গেল কেন? কেউ কি মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে? ফিউজ পুড়ে গেছে?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ— মনে পড়েছে, ওই লোকটা সম্ভবত আমার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামী। আসানসোলে একটা বাড়িতে ওরা থাকত। সেই বাড়িটার দুটো ঘর আমি কর্মসূত্রে ভাড়া নিয়েছিলাম। বছরখানেক থেকেছিলাম। তখনই আমি ওর বউয়ের প্রেমে পড়ি। কামান্ধ হয়ে ওর বউকে ফুসলে নিয়ে চলে আসি। ...এইবার বুঝেছি, ও কেন আসছে। আমাকে শাস্তি দিতে—।

মেইন গেট খোলার শব্দ পেলাম না? কে খুলল? ওই লোকটা নাকি! হ্যাঁ, নির্ঘাত ওই খুনিটা! ওর মাথায় আবার খুন চেপেছে। ও একটা পাগল! ও একটা প্রেত।

না-না, না তো— আর তো কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। নীচে গিয়ে দেখব! ... নাঃ, দরকার নেই। আমি জানি, এমন অন্ধকার রাতে নিশাচর আততায়ীরা, দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়ায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। চারদিক এত নিস্তব্ধ কেন! ...অ্যাঁ, সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি— মচমচ মচমচ! কে যেন উঠছে! ওই খুনিটাই বোধহয়!... না, আর বসে থাকা নয়, এবার লুকোতেই হবে।

আমি সোফা থেকে সন্তর্পণে উঠলাম। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় বেরোলাম। কই, কেউ কোথাও নেই। তবু আমার ভয় করছে। শরীরে কাঁপুনি দিচ্ছে। একতলার সিঁড়ির দরজা তালাবন্ধ। আমি অন্ধের মতো দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে তেতলার ছাদের দরজা খুললাম। দরজার কড়ায় তালাচাবি ঝুলছে। ছাদে গিয়ে দরজা আটকে তালায় চাবি মারলাম। আশপাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ছাদের তিন দিকের পাঁচিলও দেখা যাচ্ছে না। সহসা মনে পড়ল, ছাদের বাঁদিকে পাঁচিলের ধারে কয়েকটা বাঁশ আর শাবল পড়ে রয়েছে। এখন আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে। যদি সে আসে, তাহলে আমিও প্রস্তুত থাকব প্রত্যাঘাত করতে।

... ওই যে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আসছে, সে আসছে! শিকারি আসছে— শিকার ধরতে!

নানা ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ তখন লন্ডনে। সেটি ১৮৯৬ সাল। আমেরিকা থেকে লন্ডনে এসেছেন স্বামীজী। এক বিদেশি ভক্তের বাড়িতে রয়েছেন। তিনি সন্ন্যাসী। পরনে গেরুয়া পোশাক। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। কিন্তু খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পোশাকে কোথাও ময়লা লেগে নেই। ওই বাড়িতে দেখা করতে যেতেন স্বামীজীর ছোটো ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

একদিন স্বামীজী মহেন্দ্রনাথকে বললেন— মহেন্দ্র, সব সময় আঙ্গুলগুলি পরিষ্কার করে রাখবে। নখে যেন ময়লা না থাকে। বড়ো হলে কেটে ফেলবে। এই বলে জামার পকেট থেকে একটা নখ কাটার যন্ত্র বের করলেন স্বামীজী। বললেন আমার পকেটে সবসময় নখ কাটা ও ঘষার যন্ত্র থাকে। মহেন্দ্র তা দেখে অবাক। সন্ন্যাসী পকেট থেকে রুদ্রাক্ষ বের করছেন না, জপের মালা বের করছেন না, বের করছেন কিনা নখ কাটার যন্ত্র।

হ্যাঁ ছোটো বন্ধুরা, স্বামীজী মনে করতেন পরিষ্কার না থাকলে মন কখনও প্রফুল্ল থাকে না। এজন্য সবসময় পরিষ্কার থাকতে হবে। একজন সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী মনে করতেন সংসারে থাকতে গেলে হেসে খেলে কাটাতে হবে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন আমেরিকান ও ইংরেজদের মতো আমাদের দেশের মানুষ এমন পরিচ্ছন্ন, চালাক-চতুর, কর্মঠ ও স্বাধীনতাপ্রিয় হোক। তা না হলে এদেশের উন্নতি নেই। স্বামীজী তাই দেশের তরুণদের চরিত্র গঠন করত বলেছেন। তাঁর ছোটো ছোটো উপদেশ থেকেও অনেক বড়ো কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বোধ থেকেই সামাজিক পরিচ্ছন্নতা বোধ আসে।

আমরা যেখানে সেখানে জঞ্জাল ফেলে প্রতিনিয়ত পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছি। কলা খেয়ে খোসাটা পথে ফেলে দিচ্ছি। তার ফলে যেকোনও সময় পথচারীর বিপত্তি ঘটতে পারে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এ রকম হয় না। সে দেশে পরিচ্ছন্নতার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়।

অপরিচ্ছন্ন কোনও জাতি বড়ো হতে পারে না। কোনও ব্যক্তিও বড়ো হতে পারে না। আমাদের দেশ যে বড়ো হচ্ছে না এটাও তার একটা কারণ। স্বামীজী দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন, শুধু নিজে বড়ো হতে চাননি। আমরা তাঁর কথা শুনিনি, সেজন্য অনেকে ধনী হয়েছি ঠিকই, কিন্তু মানুষ হতে পারিনি।

স্বামীজী মনের শক্তিকে একমুখী করেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলেছেন। যখন আমাদের মন অতিশয় শান্ত ও স্থির থাকে, তখনই আমাদের ভিতরের সমুদয় শক্তিটুকু সৎকাজে ব্যয়িত হতে থাকে। কেবল শান্ত, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি কাজ করে থাকে। অভ্যাসের দ্বারাই মনের স্থিরতা আসে।

এক সময় স্বামীজী সানফ্রান্সিস্কো গিয়েছিলেন। একদিন নদীর তীর ধরে হাঁটছিলেন। তিনি দেখলেন কয়েকজন তরুণ নদীতে ভাসমান কয়েকটি ডিমের খোলা লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ছে কিন্তু বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। স্বামীজী তা দেখে মৃদু হাসলেন। তরুণরা স্বামীজীকে ওভাবে হাসতে দেখে বিরক্ত হলো। তারা স্বামীজীকে বললো, এটা আদৌ সোজা কাজ নয়। তারা স্বামীজীকে করে দেখাতে বললো। স্বামীজী বন্দুক তুলে নিলেন এবং পর পর এক ডজন ডিমের খোলার দিকে তাক করে পর পর লক্ষ্যভেদ করলেন। তরুণরা ভেবেছিল যে, স্বামীজী নিশ্চয়ই কোনও বিশারদের কাছে বন্দুক চালাতে শিখেছেন। কিন্তু স্বামীজী বললেন, জীবনে তিনি এর আগে কোনও দিন বন্দুক চালাননি। তাঁর সাফল্যের মূল কারণ হলো মানসিক স্থিরতা।

স্বামীজী এভাবেই মনকে স্থির করে যে-কোনও কাজে সাফল্য লাভ করার উপদেশ আমাদের গিয়ে গেছেন।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের পথে পথে

চেরাপুঞ্জি

উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জি খাসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। চুনাপাথরের গুহা, কয়লা, কমলালেবুর বাগিচা ও মধুর খ্যাতি সারা ভারতে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় চেরাপুঞ্জিতে। বর্তমানে চেরাপুঞ্জির কাছে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালের মৌসিনরাম বছরে ২৩০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টির জন্য রেকর্ড গড়েছে। এখানকার এক গুহায় সারা বছর গোরুর বাঁটের মতো চুনাপাথরের দণ্ড থেকে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঝরে। এখানকার আর একটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থল মৌসমাই জলপ্রপাত। চেরাপুঞ্জি সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ স্থল।

জানো কি?

- বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋকবেদ।
- পঞ্জাবের লোকনৃত্যের নাম ভাঙরা।
- বোলপুর শহর কোপাই নদীর তীরে।
- ভারতমাতা চিত্রটি অঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু) ১৯৪৫ সালে তৈরি হয়।
- সবচেয়ে দামি মশলার নাম জাফরান।
- ৭৬ বছর পর হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়।

ভালো কথা

রবীন্দ্রজয়ন্তী

এবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আমাদের পুরো পাড়াটাই মেতে উঠেছিল। দু'মাস আগেই শচীনজেঠু বলে রেখেছিলেন পাড়ার সবাইকে অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য। সেজন্যে ক্লাবে ও বাড়িতে বাড়িতে অভ্যাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সকালে হলো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সুমনের ঠাকুমা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আবৃত্তি করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। ছোটোদের ডাকঘর নাটকে আমি অমলের অভিনয় করেছি। আমার বন্ধু সুবল দইওয়ালার অভিনয় করেছে। আমাদের সারা পাড়া সেদিন আনন্দে মেতে উঠেছিল।

সায়ণ চৌধুরী, সপ্তম শ্রেণী, চিৎকোল, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) তা হি দু মা য় ল	(১) র ঃ ন্ত র্বা স ক নে
(২) ণা স্ব ষ দে তৈ শ	(২) য় স র্ব জ শ্র ন দ্ধে

৭ মে সংখ্যার উত্তর

(১) এবড়োখেবড়ো (২) কথকঠাকুর

৭ মে সংখ্যার উত্তর

(১) কন্যাসন্তান (২) জামাইবাবু

উত্তরদাতার নাম

(১) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা। (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (৩) অরিত্র দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী। (৪) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, বর্ধমান।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ১১

তাই হল। অর্জুনকে সরানো হলো। দ্রোণ আক্রমণ করলেন। অর্জুন দূরে থাকায় পাণ্ডব বাহিনী পশ্চাৎপদ হল।

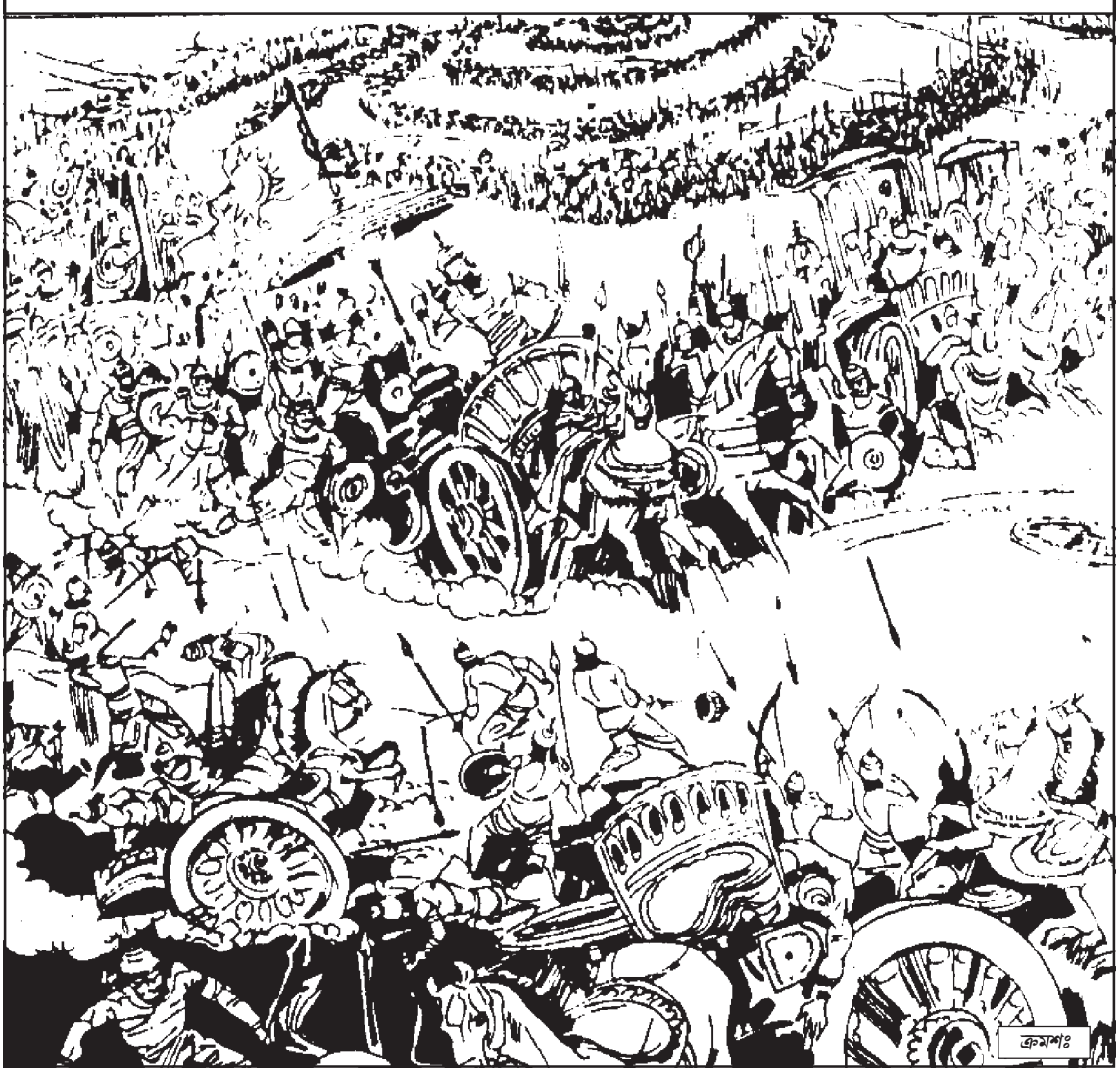

বিশ্বকাপ ও জুলে রিমে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর এক মাস পরেই গোটা দুনিয়া মেতে উঠবে বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে। ৩২টি দেশ খেলবে এবারের বিশ্বকাপে। রাশিয়ার ১০টি শহরে খেলাগুলি হবে। এক মাস ব্যাপী এই মহারাজসূয় যজ্ঞ বিশ্বের সব ধর্ম,বর্ণ, সম্প্রদায়ের মানুষকে এক করে রাখে। এই ইভেন্টের নিপুণ চালিকার কাজ করে বিশ্বের সব বড় বড় বহুজাতিক শিল্প সংস্থা। ফিফার স্পনসর হিসেবে এইসব সংস্থা আয়োজক দেশ ও ফিফাকে দেয় কয়েকশো কোটি ডলার। আজ তাই বিশ্বকাপ ফুটবল সব অর্থেই এক মহাজাগতিক কর্মযজ্ঞ। আর এই কর্মযজ্ঞ শুরুর নেপথ্যে চালক ছিলেন জুলে রিমে। ১৮৭১ সালের ২৫ অক্টোবর ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন জুলে রিমে। কিশোর বয়স থেকেই ফুটবল পাগল ছিলেন তিনি। তখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ফুটবল তার ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। ইউরোপ ছাড়া অন্যান্য মহাদেশে তেমন একটা সংগঠিত ভাবে ফুটবল খেলা হতো না। ভারতে সর্বপ্রথম কলকাতাতেই ফুটবল ক্লাব গড়ে ওঠে। আস্তে আস্তে ব্রিটিশ সামরিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় এরিয়ান, মোহনবাগান, শোভাবাজার, মহামেডান আদ্যন্ত বাঙালি ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠন করে কলকাতা লিগ ও শিল্ড খেলতে শুরু করে।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে মোটামুটি বিশ্ব জুড়ে সব মহাদেশেই ফুটবল তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পায় জুলে রিমে ও তার সহযোগীদের উদ্যোগে। ফিফার জন্ম হয় ১৯০৪ সালের ২১ মে। নেপথ্যে সেই জুলে রিমে ও তার সহযোগী সুইডেনের রাজা কার্ল, ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্য লর্ড কিন্ডলে। জুলে রিমে ফ্রান্সের প্রথম শ্রেণীর ক্লাব ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা ও সমাজ বিজ্ঞানী হওয়ার দৌলতে বুঝেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সব জাতি ও সমাজকে একসূত্রে গেঁথে উন্নত মানবসভ্যতা গঠনের চাবিকাঠি হবে ফুটবল ও বিশ্বকাপ। তাই তিনি প্রথম ফিফা কংগ্রেসে সব সদস্য দেশ যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং মার্কিন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষে স্থির করেন, বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতাই হবে ফিফার অন্যতম প্রধান সাংগঠনিক রূপরেখা। ১৯০৪ সালের ১ মে অর্থাৎ ইতিহাসে স্থান পেয়ে যাওয়া মে-ডেতে জুলে রিমের উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এই ম্যাচে অংশ নিয়ে বিশ্বকাপের নান্দীমুখ রচনা করে।

এরপর ওই বছর ২১ মে আনুষ্ঠানিক প্রথম ফিফা কংগ্রেসে বিশ্ব কাপ আয়োজনের প্রস্তাব সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে গৃহীত হয় এবং তাতে সিলমোহর দেয় ১০টি সদস্য দেশ। তবে সেই বিশ্বকাপ আয়োজন করতে লেগে যায় আরো ২৬ বছর। ১৯২০ সালে ফিফা প্রেসিডেন্ট হন জুলে রিমে। তার আগে যাঁরা প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁরা কেবলমাত্র বিশ্বকাপ সংগঠনের আলাপ আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। প্রস্তাবটি সনদ আকারে পাশ হয়ে যাওয়ার পরও তা কার্যকর রূপ পায়নি নানা জটিলতায়। জুলে রিমে প্রেসিডেন্ট হয়েই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব দিলেন নতুন সদস্য হওয়া দেশ উরুগুয়েকে। তখন বিশ্বকাপের নাম ছিল জুলে রিমে।

১৯২৭ সালে বিশ্বকাপ আয়োজনের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফিফা। তাতে বলা হয় ইউরোপিয়ান কাপ প্রতি ২ বছর অন্তর, বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা কাপ ৪ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। পরে অবশ্য সিদ্ধান্ত পাল্টে ইউরো কাপও ৪ বছর অন্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৩০ সাল ছিল উরুগুয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তির শতবর্ষ। আর তখন বিশ্বের সব কটি বড় ইভেন্টে ফুটবলে অপরাজেয় ছিল উরুগুয়ে। তাই তাদের এই দায়িত্ব দিয়ে সম্মান দেয় ফিফা। ফিফা কংগ্রেসে স্থির হয় আয়োজক দেশকেই সমস্ত খরচ-খরচা বহন করতে হবে। তখন ফিফার আর্থিক অবস্থা এত ভালো ছিল না আয়োজক ও সংগঠক দেশকে কোনও প্রকার সাহায্য করার মতো। বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থার কাছে হাত পেতে উরুগুয়ের কর্মকর্তারা যে অর্থ জোগাড় করেছিলেন, তা দিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ মোটামুটি উতরে গিয়েছিল। আর বলা বাহুল্য প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল উরুগুয়েই। ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দেয় উরুগুয়ে। এরপর প্রায় প্রতিটি জুলে রিমে বিশ্বকাপে উরুগুয়ে, ব্রাজিল তথা লাতিন আমেরিকার প্রাধান্য ছিল অব্যাহত। মাঝে অবশ্য ইতালি বিক্ষিপ্তভাবে দাপট দেখিয়েছে। ব্রাজিল তিনবার জিতে জুলে রিমে কাপ চিরকালের মতো নিজের হেফাজতে নিয়ে যায়। ১৯৭০ সালে সোনার পরি এই কাপ রিওতে চলে যাবার পর আর কোনও ব্যক্তির নামে বিশ্বকাপ না করার সিদ্ধান্ত নেয় ফিফা। সত্তরের দশকের সূচনায় ফিফা প্রেসিডেন্ট হয়ে ব্রাজিলের ব্যাঙ্কার-শিল্পপতি জোয়াও হ্যাভেল্যাঞ্জ ফিফার ২০০ সদস্যদের প্রতিনিধিদের রাজি করিয়ে নাম দেন ফিফা বিশ্বকাপ। সেই ট্রাডিশন চলছে। ফিফা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগঠন, সব ক্ষেত্র মিলিয়ে। ২১০টি দেশ এর সদস্য। ■

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৩৯তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ২৪শে জুন ২০১৮

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

জাতীয় বিপ্লববাদের উত্তরণ :

মহা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

রাসবিহারীর মতে এশিয় দেশগুলির মধ্যে দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে। তাই তাদের পারস্পরিক মিত্রতা স্থাপন প্রয়োজন। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপান ও চীন উভয়ের সঙ্গে পারস্পরিক মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রচেষ্টা সফল হলে ভারত, চীন ও জাপান সম্মিলিতভাবে বিশ্বরাজনীতির নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠবে। রাসবিহারী প্রদর্শিত পথেই এক কূটনৈতিক বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি উন্মোচন করেছিলেন তা বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা ও পঞ্জাবে বিকশিত হয়। নব্য জাতীয়তাবাদী তরঙ্গের তিন প্রাণপুরুষ ছিলেন লাল- বাল-পাল অর্থাৎ পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও বাংলার তিন জননেতা।

এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি হলো জাতীয় বিপ্লববাদ। আর এই বিপ্লববাদের দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসে রাসবিহারী বসু ধারাবাহিকভাবে তাঁর কর্মকাণ্ডের নজির রেখেছেন।

বিপ্লববাদের চারটি বৃত্ত ঃ

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে রাসবিহারী বসুর ভূমিকা অনন্য ও ব্যতিক্রমী কেন, তা জানতে হলে স্মরণে রাখা প্রয়োজন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের চরিত্র স্থবির নয়। ভারতে জাতীয় বিপ্লববাদের ইতিহাস চারটি বলয়ের উপর গ্রথিত ছিল। এগুলি হলো স্থানিক (local), আঞ্চলিক (regional), জাতীয় (national) আর আন্তর্জাতিক (global)। অন্য বিপ্লববাদীদের সঙ্গে রাসবিহারীর প্রধান পার্থক্য হলো যে, তিনি চারটি স্তরের অভাবনীয় কীর্তির পরিচয় রেখেছেন। বোধকরি লালা হরদয়াল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লববাদের শিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন। অন্যদিকে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা এবং মাদাম কামা প্রবাসে বিপ্লববাদের গোড়াপত্তন করলেও জাতীয় স্তরে তেমন ভূমিকা গ্রহণ করেননি।

এই জন্যই রাসবিহারী ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে এক কালজয়ী চরিত্র। দীর্ঘ চারদশকের বৈপ্লবিক জীবনে তিনি কখনও থেমে থাকেননি। প্রথমে স্থানিক ও আঞ্চলিক স্তরে রাসবিহারীর ভূমিকা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরের সন্তান রাসবিহারী বনবিভাগে সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই চন্দননগর বাংলার অন্যতম বিপ্লবতীর্থে পরিণত হয়। চন্দননগরে বিপ্লববাদী আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মীরা যেমন কানাইলাল দত্ত, রাসবিহারী বসু প্রমুখের দীক্ষাগুরু ছিলেন চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়। চন্দননগরে বিপ্লববাদী কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মনীন্দ্রনাথ নায়েক ও মতিলাল রায়ের উদ্যোগে চন্দননগরে গোপনে বোমা তৈরির প্রচেষ্টা হয়। রাসবিহারী বসু চন্দননগরে বিপ্লবী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন। রাসবিহারী সিদ্ধান্ত নিলেন ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জের রাজকীয় সমারোহের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হবে। রাসবিহারীর নির্দেশমতো বসন্তকুমার বিশ্বাস হার্ডিঞ্জের হাতির উপর বোমা ফেললেন। হার্ডিঞ্জ সামান্য আহত হলেন। তবে হাতির মাহুত ঘটনা স্থলে মারা যায়। দিল্লির বোমা বিস্ফোরণের পর দিল্লিতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলো। বসন্ত বিশ্বাস, আউধবিহারী, বালমুকুন্দ, আমীর চাঁদ প্রমুখ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

এইভাবেই রাসবিহারী স্থানিক ও আঞ্চলিক স্তর থেকে জাতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লববাদের পরিসর প্রসারিত করতে সচেষ্ট হন।

দুই বিশ্বযুদ্ধে রাসবিহারীর ভূমিকা ঃ

রাসবিহারী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানার সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাসবিহারী বাংলা ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বেনারসের বাসিন্দা বাঙালি বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। এই সময়ে উত্তর আমেরিকা ও জার্মানিতে ভারতীয় বিপ্লবীরা ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিধ্বস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। অবশ্য মহেন্দ্র প্রতাপ ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ কাবুলে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাসবিহারীর রণকৌশল ছিল ভিন্ন ধরনের। ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯১৫) অভ্যুত্থানের দিন ধার্য হল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সর্তক হয়ে পড়ল এবং পরিকল্পিত অভ্যুত্থান অধরা রয়ে গেল। রাসবিহারী কৌশলে পুলিশের হাতে ধরা পড়েননি। কিন্তু আত্মগোপনে বেশিদিন থাকা সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে

দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় পি. এন. ঠাকুরের ছদ্মবেশে সানুকিমারু নামে জাপানি জাহাজে ১২ মে ১৯১৫ জাপানে চলে যান। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর জাপানি নাগরিকের অধিকার অর্জন করেন। জাপানে থাকার সময় লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে মিলিত হন এবং এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে যৌথভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের রণকৌশল গ্রহণ করেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি অবিচল আস্থা রেখেই রাসবিহারী ১৯২৪ সালে জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ স্থাপন করেন। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠন করা।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। এবার জাপান ও জার্মানি মিত্রতাবদ্ধ হয়ে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। জার্মানির কর্মকেন্দ্র ছিল ইউরোপ আর জাপান সমগ্র প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যত হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফরাসি, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। বার্মার পতনের পর (মার্চ ১৯৪২) ভারতে ব্রিটিশ শাসন হয়ে উঠল জাপানের আক্রমণের লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীজী ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লিগ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়াল। নেতাজী সুভাষ গোপনে ভারত থেকে চলে গিয়ে জার্মানি থেকে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে প্রচার শুরু করলেন। অন্যদিকে, মার্চ মাসে (১৯৪২) রেঙ্গুনের পতনের পর টোকিয়োতে রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়েই ২১ মার্চ রাসবিহারী বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে এক ঐতিহাসিক চিঠিতে লিখলেন, ব্রিটেনের শত্রু জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। এই জন্য রাসবিহারী পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার কথা বললেন। রাসবিহারী এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য সাভারকরের পূর্ণ সমর্থন চাইলেন। তিনি লিখলেন, 'I know that I shall not succeed in my attempt unless yourself and other leaders at home support at the right time.' ভাবতে পারেন, যে সাভারকরকে ব্রিটিশের মিত্র বলে কংগ্রেসি ও বামপন্থী লেখকরা ভর্ৎসনা করেন, সেই সাভারকরকেই ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব নেওয়ার আহ্বান জানালেন রাসবিহারী! পত্রে রাসবিহারী জানালেন ভারতীয় সেনারা সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানী হতে দ্বিধা করবেন না।

রাসবিহারী পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু করে দিলেন। ব্যাঙ্ককে ১৯৪২ সালের ১৫ জুন ভারতীয়দের এক বিশাল সমাবেশে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুললেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League) প্রতিষ্ঠিত হল। পাশাপাশি মুক্তি যুদ্ধের জন্য আজাদ-হিন্দ-বাহিনী গঠিত হল। ৪০ হাজার ভারতীয় সেনা এই বাহিনীতে যোগদান করলেন।

রাসবিহারী যে কাজ শুরু করেছিলেন, তারই সার্থক পরিণতি হল সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীর সশস্ত্র অভিযান। রাসবিহারীর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এলেন এবং ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই রাসবিহারীর হাত থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ঐতিহাসিক অর্থে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন রাসবিহারী। আর তারই পরিণতি হলো সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত অভিমুখে সামরিক অভিযান।

এশিয়ার ঐক্য ঃ রাসবিহারীর ঐতিহ্য

রাসবিহারী এশিয়া থেকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে উৎখাতের জন্য এশিয়ার দেশগুলির যৌথ প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু চীন দুর্বল হওয়ায় সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। তাঁর মতে এশিয় দেশগুলির মধ্যে দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে। তাই তাদের পারস্পরিক মিত্রতা স্থাপন প্রয়োজন। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপান ও চীন উভয়ের সঙ্গে পারস্পরিক মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রচেষ্টা সফল হলে ভারত, চীন ও জাপান সম্মিলিতভাবে বিশ্বরাজনীতির নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠবে। রাসবিহারী প্রদর্শিত পথেই এক কূটনৈতিক বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত হবে। ■

সাভারকর এক ভাস্বর, মহান, অপরাজিত বীর

রাজর্ষি সেনগুপ্ত

লন্ডনে যে বাড়িটিতে বিনায়ক দামোদর সাভারকর বাস করতেন, ১৯৮৫ সালের জুন মাসে সেই বাড়িটার সামনে একটি স্মারক প্রতিষ্ঠা করে গ্রেটার লন্ডন কাউন্সিল। ব্রিটিশ সরকারি পরিভাষায় এ ধরনের স্মারককে বলে ব্লু প্লাক। এই স্মারক প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ সরকার কার্যত ব্যক্তিবিশেষকে সম্মান প্রদর্শন করে। সাভারকর যে বাড়িটিতে বসবাস করতেন, সেই বাড়িটির সামনে যে ব্লু প্লাকটি স্থাপন করা হয়েছে, তাতে উৎকীর্ণ রয়েছে এই কথাগুলি— 'Vinayak Damodar Savarkar 1883–1966. Indian Patriot and Philosopher lived here.' বেশি কথা নয়। স্বল্প কথাতেই ব্রিটিশরা তাদের সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সাভারকরকে। ওই ব্লু প্লাকের আবরণ উন্মোচন করতে এসে বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ লর্ড ফেনার ব্রুকওয়ে বলেছিলেন— 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনেক আগেই সাভারকর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন।' এই অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটার সুনীল মনোহর গাভাসকর।

সাভারকর তাঁর সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণতলে। আজীবন অসীম লাঞ্ছনা এবং নিপীড়ন ভোগ করেছেন। পরিবর্তে যে শ্রদ্ধা এবং সম্মানটুকু তাঁর প্রাপ্য ছিল দেশের কাছে, সেটি তিনি পাননি। তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা এবং কুৎসা রটানো হয়েছে। বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক অবদানকে। কিছু নেহরুপন্থী ঐতিহাসিকের সহযোগিতায় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সাভারকরের রাজনৈতিক সংগ্রামকে। ইতালিয়ান রাহুল গান্ধী এবং পাকিস্তানপন্থী কানহাইয়াকুমারের মতো ইতিহাস অজ্ঞ রাজনীতিবিদরা সাভারকরের দেশপ্রেম নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন! সাভারকর তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কোনও আশ্রম খুলে সন্ত সাজতে যাননি। ব্রিটিশ আতিথেয়তায় বন্দি জীবনের নাটকও করেননি সাভারকর। বরং দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে বারবার তিনি আগুনের ভিতর ঝাঁপ দিয়েছেন। আন্দামানে কারাবাসকালে অসহ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। যাঁরা আজ সাভারকরকে 'দেশদ্রোহী' তকমা দিয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের কলঙ্ক আড়াল করতে চাইছেন— তাঁরা ইতিহাসের ওই অধ্যায়টি হয় জানেন না, বা জেনেও ভুলে থাকার ভান করেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর জীবনের অমূল্য ২৭টি বছর কাটিয়েছেন কারান্তরালে। ব্রিটিশ শাসনে এবং স্বাধীন ভারতেও। সাভারকর প্রথম গ্রেপ্তার হন ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ, পারি থেকে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনে শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে বলেছিলেন ঘুরপথে লন্ডনে পৌঁছতে। সাভারকর সে কথায় কর্ণপাত না করে বলেছিলেন, 'নেতা হিসাবে আমাকে আক্রমণের মুখোমুখি হতেই হবে।' সাভারকরকে ১৮৮১ সনের ফিউজিটিভ অফেন্ডারস অ্যাক্টে বন্দি করা হয়। সাভারকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, (১) ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, (২) ভারত সম্রাটকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার চক্রান্ত, (৩) মি: জ্যাকসনকে হত্যা কারার জন্য বিদেশি অস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ, (৪) লন্ডনে বসে অস্ত্র সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের কাছে প্রেরণ এবং (৫) ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে এবং ১৯০৮-০৯ সালে লন্ডনে বিদ্রোহমূলক ভাষণ। লন্ডনের আদালত সাভারকরকে বন্দি অবস্থায় ভারতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। সেই মতো ১৯১০ সালের ১ জুলাই এস এস ময়রা জাহাজে কড়া পুলিশি পাহারায় তাঁকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। ৭ জুলাই এস এস ময়রা জাহাজ যখন মার্সাই বন্দরে এসে পৌঁছয়, তখন প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করেন সাভারকর। কিন্তু সফল হননি। পাড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে।

১৯১০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ে বিচার শুরু হয় সাভারকরের। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারক সাভারকরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দেন। এছাড়াও, নাসিকের কালেক্টর মি: জ্যাকসনকে হত্যার অভিযোগেও সাভারকারের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলাতেও সাভারকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। একই জীবনে দু-দুটি যাবজ্জীবনের দণ্ড! জওহরলাল নেহরু এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতো কংগ্রেস নেতারা যখন ব্রিটিশ আতিথেয়তায় পুস্তক লিখে এবং চরকা কাটার বিলাসিতা করে কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন, তখন আন্দামানের কারান্তরালে কেমন কেটেছিল সাভারকারের দিনগুলি? মানিকতলা বোমার মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত আন্দামানের কারাগারে ব্রিটিশের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। আর একজন বিপ্লবী ইন্দুভূষণ রায় অত্যাচার সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। তাঁদেরই মতো অকথ্য

অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছিল সাভারকরকেও। আন্দামানে সেলুলার কারাগারে সব থেকে কষ্টদায়ক কাজটি ছিল নারকেলের ছিবড়া ছাড়িয়ে দৈনিক ৩০ পাউণ্ড তেল বের করা। সাভারকরকে এই কাজটি দেওয়া হয়েছিল। এ কাজ না পারলেই নেমে আসত অত্যাচার। কী ধরনের অত্যাচার? ইলেকট্রিক ব্যাটারির ছেঁকা, দু' পায়ের পাতার মাঝখানে অনেকটা ফাঁক রেখে দু' পায়ের গোড়ালিতে আলাদা করে দুটি লোহার বেড়ি আর চেন দিয়ে বাঁধা। এতে হাত-পা অসাড় হয়ে আসত। দেওয়ালে গাঁথা পেরেকের সঙ্গে দুটি হাত শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা। কোমর আর গোড়ালিতে লোহার বেড়ি পরিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা। এসবের সঙ্গে উপরি পাওনা ছিল খেতে না দেওয়া। সাভারকরের দেশপ্রেম নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরা বলতে পারবেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের ক'জনকে ব্রিটিশ কারাগারে এত অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল?

এদেশের বামপন্থীরাও সাভারকরকে কালিমালিপ্ত করে থাকেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকরের অবদানকে অস্বীকার করতে চান তাঁরা। তাঁরা সম্ভবত জানেন না, কমিউনিস্টদের আগেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিয়েছিলেন সাভারকরই। সেই বিদ্রোহ সম্পর্কে সাভারকরের লেখা গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। ১৯১০ সালে সাভারকর ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হওয়ার পর তাঁর মুক্তির দাবিতে সরব হন গাই আলফ্রেড। কে এই গাই আলফ্রেড? তিনি ছিলেন ব্রিটেনের এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট। এদেশের কমিউনিস্টরা সম্ভবত জানেন না যে, ১৯০৯ সালে লন্ডনে অন্তত তিনবার সাভারকরের সঙ্গে ভ্লাদিমির লেনিনের গোপন বৈঠক হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মদনলাল ধিংড়া। একটিতে উপস্থিত ছিলেন গাই আলফ্রেড। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে সাভারকরের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন লেনিন। সাভারকরের মুক্তির দাবিতে আরও একজনও সরব হয়েছিলেন। তিনি জাঁ লঁগেত, কার্ল মার্ক্সের নাতি। সাভারকর সম্পর্কে কুৎসা রটাতে গিয়ে এদেশের নেহরুবাদী এবং বামপন্থীরা বলেন, তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের যোগ দিতে বলে ব্রিটিশদের কার্যত সাহায্য করেছিলেন। মিথ্যা খারাপ। কিন্তু তার থেকেও খারাপ অর্ধসত্য। ১৯২৪ সালে সাভারকর ব্রিটিশ কারাগার থেকে মুক্তি পান। কিন্তু মুক্তি পেয়েও বিপ্লব প্রচেষ্টা থেকে সরে আসেননি সাভারকর। বরং গোপনে বিপ্লবের প্রস্তুতিই করে গিয়েছেন। সাভারকর মনে করতেন, ভারতীয়দের সমরশিক্ষায় শিক্ষিত না করলে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। ১৯৪০ সালের ২২ জুন সাভারকারের দাদারের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে পরামর্শ দেন দেশের বাইরে গিয়ে বাহিনী গড়ে তুলে ভারতকে ব্রিটিশমুক্ত করতে। ১৯৪৪ সালের ২৫ জুন আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, 'যখন কংগ্রেস দলের বিপথগামী চিন্তন ও দিশাহীনতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনারা ভাড়াটে সেনার মতো দিন কাটানোর যন্ত্রণা ভোগ করছেন, সেসময় অকুতোভয় সাভারকরের ভারতীয় যুবকদের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের পরামর্শ যেন প্রাণের সঞ্চার। ওই যুবকদের অন্তর্ভুক্তি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির জন্য সেনা সরবরাহে সাহায্য করবে।' ওই সময়ের বেশ কিছু ব্রিটিশ সংবাদপত্রও লিখেছিল যে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের ঢুকিয়ে ব্রিটিশদের সামরিক কৌশল জেনে নেওয়ার চেষ্টাই করেছেন সাভারকর। এরপর নিশ্চয়ই নেহরুপন্থী আর সেকুলারপন্থীদের বলে বোঝাতে হবে না, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক কৌশলের অঙ্গ হিসাবে সাভারকর ভারতীয় যুবকদের সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন।

গেরিলা যুদ্ধে আস্থা রাখতেন সাভারকর। একজন গেরিলা যোদ্ধার মতোই বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নানারকম কৌশল এবং আবরণের সাহায্য নিতেন তিনি। ১৯৪২ সালের ১৮ মার্চ সাভারকরকে লেখা একটি চিঠিতে রাসবিহারী বসু লিখেছিলেন— 'আপনার কারাগার থেকে বেরিয়ে আসাটা খুবই ভালো হয়েছে। আমি এর পিছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্যই দেখতে পাচ্ছি।' রাসবিহারী এই চিঠিতে সাভারকরের বিপ্লবী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাসবিহারী বসু এবং সমসাময়িক অন্যান্য কয়েকজন বিপ্লবী কখনই চাননি সাভারকর আন্দামানের কারাগারে তাঁর বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিন। বরং, আন্দামানের কারাগার থেকে সাভারকরকে মুক্ত করে আনার পরিকল্পনা তাঁরা করেছিলেন। ১৯১৪ সালে জার্মানিতে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, লালা হরদয়াল, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, চম্পারণ পিল্লাই প্রমুখের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ গঠিত হয়। ঠিক হয়, যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত তিনটি জাহাজ পাঠানো হবে ভারতে। প্রথমটিতে থাকবে পাঁচশো জন জার্মান অফিসার সহ এক হাজার সেনা, তাদের লক্ষ্য হবে আন্দামান জেল থেকে সাভারকর-সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের মুক্ত করে আনা। দ্বিতীয় জাহাজটি যাবে বাংলার উদ্দেশে। তৃতীয়টি যাবে পশ্চিম উপকূলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশরা এই সংবাদ জেনে যায় এবং জার্মান জাহাজ এমডেন ধ্বংস করে। ফলে সাভারকরদের মুক্তির পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলেও সাভারকরের বিপ্লবী বন্ধুরা সবসময়ই চাইতেন, ছলে বলে কৌশলে সাভারকর কারাগারের বাইরে আসুন এবং বিপ্লবের কাজে নেতৃত্ব দিন। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ কারাগার থেকে বেরিয়ে আসা যে সেই কৌশলেরই একটি অঙ্গ ছিল তা ইতিহাসের আগ্রহী ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সাভারকর ব্রিটিশ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তা তো বোঝাই যায় তৎপরবর্তীতে রাসবিহারী বসুর পরামর্শে সাভারকরের সুভাষচন্দ্রকে দেশের বাইরে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করার পরামর্শ দেওয়ায়।

সাভারকরের সমালোচনা যাঁরা করছেন, কুৎসা রটিয়ে সাভারকর চরিত্রটি যাঁরা কালিমালিপ্ত করতে চাইছেন— তাঁদের প্রতি একটিই পরামর্শ। ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুধ্যান করুন। ইতিহাসকে বিকৃত করবেন না। কলঙ্কিত করবেন না ভারতমাতার এক বীর সন্তানকে। পারিবারিক কলঙ্ককে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় যদি সাভারকরকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করেন, তাহলে জানবেন, ইতিহাস আপনাদেরও ক্ষমা করবে না।

রামায়ণ সার্কিটের উদ্বোধন করে নেপালের মন জয় করলেন মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দু-দিনের নেপাল সফরে গিয়ে সম্প্রতি 'রামায়ণ সার্কিটে'র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যা থেকে সীতার জন্মস্থান নেপালের জনকপুর পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করা ছাড়াও, জনকপুরের উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রকল্পও ঘোষণা করেছেন মোদী। এই রামায়ণ সার্কিটের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নেপালের সীতাকে বাদ দিয়ে ভারতের রাম অসম্পূর্ণ। তেমনই নেপালের ইতিহাসকে বাদ দিলে ভারতের ইতিহাসও অসম্পূর্ণ।' তবে প্রধানমন্ত্রীর এই রামায়ণ সার্কিট সম্পর্কে ইতিমধ্যেই নেপালে বেশ ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। ওই দেশের মানুষ মনে করছেন, রামায়ণ সার্কিটের ফলে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কেরই যে শুধু উন্নতি ঘটবে— তাই নয়। বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হবে। বিশেষ করে পর্যটন শিল্পের আরও প্রসার ঘটবে। নেপাল সরকারের পর্যটন মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরই ভারত থেকে প্রচুর সংখ্যায় ট্যুরিস্ট নেপালে আসেন। এর ভিতর একটি বড় অংশের পর্যটক আসেন জনকপুরে। অযোধ্যা থেকে জনকপুর বাস পরিষেবা চালু হয়ে দুই দেশেই পর্যটকদের যাতায়াত আরও বাড়বে বলেই আশা পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলির।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে তৃতীয়বার নেপালে এলেন। নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানের পর থেকেই ভারত-নেপাল সম্পর্কে একটা টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ভারতকে চাপে রাখতে চীন নেপালের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিতে মন দিয়েছে। তাঁর নেপাল সফরে নরেন্দ্র মোদী এর আগেও চেষ্টা করেছেন, ভারত-নেপাল সম্পর্কের ভিতর টানাপোড়েন দূর করে অতীতের সুসম্পর্ককে আবার ফিরিয়ে আনতে। কয়েকমাস আগে নেপালের সাধারণ নির্বাচনে নেপাল কংগ্রেসকে পরাজিত করে কে পি ওলির নেতৃত্বে বামপন্থীরা ক্ষমতায়

এসেছে। নেপাল কংগ্রেসের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ওলির নেতৃত্বে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর চীন নেপালকে কাছে পেতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই নেপালে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছে চীন। এরকমই একটি পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীর নেপাল সফর কূটনৈতিক দিক দিয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নরেন্দ্র মোদী তাঁর নেপাল সফরে জনকপুরে নেপালি ও মৈথিলি ভাষায় বক্তৃতা দেন। বলেন, 'আমি এবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেপালে আসিনি। এসেছি একজন সাধারণ তীর্থযাত্রী হিসাবে। এর আগের বার নেপাল সফরে এসে সীতা দেবীর জন্মস্থান জনকপুরে আমার আসা হয়নি। এবার এই পবিত্র স্থানটি দর্শন করে গেলাম।' তবে, শুধু রামায়ণ সার্কিটেরই উদ্বোধন নয়। মোদীর ভাষণে কূটনীতিও ঘুরে ফিরে এসেছে। মোদী বলেছেন, দু'দেশের সম্পর্কের আরও উন্নতি ঘটাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে ভারত যে নেপালকে আরও সহযোগিতা করবে, সে আশ্বাসও মোদী দেন। মোদী বলেন, অতীতেও সংকটের সময় ভারত বরাবরই নেপালের পাশে ছিল। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে নেপালের স্থান প্রথম।

নেপালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ফলে, রামায়ণ সার্কিট চালু করায় মোদী তাদের মন জয় করেছেন। বিশেষত নেপালের তরাই অঞ্চলে মোদীকে যেভাবে সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছে— তাতে এটা আরও বেশি প্রমাণিত হয়েছে। মোদীর এই সফরে উৎফুল্ল ভারতের কূটনৈতিক মহলও। তারাও বলছে, যেভাবে মোদী নেপালের সাধারণ মানুষের মন জয় করেছেন এবং নেপালের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— তাতে চট করে চীন নেপালকে ভারতের থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আগ্রহে সম্প্রসারিত হচ্ছে বুদ্ধিস্ট সার্কিট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার ছাড়াও 'বুদ্ধিস্ট সার্কিট' আরও সম্প্রসারণের দিকে এবার নজর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক জানাচ্ছে, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, গোয়া, গুজরাট এবং জম্মু ও কাশ্মীর এবার এই বুদ্ধিস্ট সার্কিটের ভিতর স্থান পেতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এসব রাজ্যে অবস্থিত

বেশ কিছু বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার এবং বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত স্থান চিহ্নিত করেছে পর্যটন মন্ত্রক। নতুন এই স্থানগুলিকে কীভাবে পর্যটন মানচিত্রে আনা যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনাও শুরু হয়েছে। 'বুদ্ধিস্ট সার্কিট'-এর ভিতর এই নতুন স্থানগুলি নিয়ে আসা এবং এসব জায়গা পর্যটক-অনুকূল করে তোলার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ইতিমধ্যেই ৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের আওতায় মধ্যপ্রদেশকে ৭৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই টাকা মূলত দেওয়া হয়েছে সাঁচী, সাতনা, রেওয়া, মান্দাসুর এবং ধার— এই পর্যটন কেন্দ্রগুলির আরও উন্নতিকল্পে। এই প্রকল্পের ভিতর রয়েছে বুদ্ধিস্ট থিম পার্ক তৈরি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, পর্যটকদের জন্য বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ যুগ সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র, নানাবিধ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান প্রভৃতি। মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও গুজরাটকে ৩৬ কোটি এবং অন্ধ্রপ্রদেশকেও ৫২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

পর্যটক মন্ত্রক বলছে, বুদ্ধিস্ট সার্কিটকে এভাবে সম্প্রসারণ করার বিষয়ে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষ আগ্রহই কাজ করছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বক্তব্য, বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারত। প্রধান প্রধান বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলিও ভারতে অবস্থিত। তাহলে প্রতিবছর বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের মাত্র এক শতাংশ ভারতে আসেন কেন? প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর চাইছে, বুদ্ধিস্ট সার্কিট আরও প্রসারিত করে এবং পর্যটকদের জন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করে পাশ্চাত্যের পর্যটকদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করতে। সেই সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় আসেন এবং বারে বারে আসেন সেদিকেও নজর দিতে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর মনে করছে, বুদ্ধিস্ট সার্কিট এভাবে সম্প্রসারিত করতে পারলে দেশে পর্যটন শিল্পেরও আরও উন্নতি ঘটবে।

ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট সার্কিট গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বুদ্ধিস্ট সার্কিটই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। নেপালের লুম্বিনী থেকে শুরু করে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনগর, রাজগীর, বৈশালী, শ্রাবস্তী এবং সঙ্কোশিয়াকে নিয়ে এই বুদ্ধিস্ট সার্কিট গড়ে উঠেছিল। এর পরিধিকেই এখন আরও বাড়ানো হয়েছে। বুদ্ধিস্ট সার্কিটকে আরও প্রসারিত করার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই পর্যটন মন্ত্রক বিশ্ব ব্যাংক এবং জাপান সরকারের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে তাদেরও সহযোগিতা চাওয়া হবে বলে পর্যটন মন্ত্রক জানিয়েছে।

পর্যটন মন্ত্রী কে জে আলফনস বলেছেন, 'দর্শনীয় বৌদ্ধ বিহার এবং স্তূপগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের অনেক অর্থের প্রয়োজন। রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর, হোটেল, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা এসবের দিকে আরও বেশি করে নজর দিতে হবে আমাদের। সারনাথের জন্য আমাদের আগামী প্রকল্প ঠিক করা হয়ে গিয়েছে।

এখন অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রকল্পের বিষয়ে বেশ কিছু জাপানি সংস্থার সঙ্গে কথা চলছে আমাদের।' পর্যটন মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুযায়ী সারনাথ হবে এদেশে বুদ্ধিস্ট সার্কিটের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকে অন্যান্য দর্শনীয় জায়গাগুলির সঙ্গে রেল, সড়ক এবং বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটানো হবে। এছাড়াও, পর্যটন পরিকাঠামো আরও উন্নত করার জন্য বেসরকারি উদ্যোগকেও স্বাগত জানানো হবে বলে বলছে পর্যটন মন্ত্রক।

বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে জড়িত এবং ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে আরও পর্যটকপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে এক বছর অন্তর বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। ২০১৬ সালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারনাথে। এবছর অক্টোবরে এই সম্মেলন হওয়ার কথা। তবে তা কোথায় হবে সেই জায়গা এখনও স্থির হয়নি।

সংঘর্ষ বিরতির সম্ভাবনা ওড়ালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি দমনে কড়া কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আসন্ন রমজান ও অমরনাথ যাত্রার সময় জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির সংঘর্ষ-বিরতির ডাক নাকচ করে দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা

মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। গত ৯ মে মুফতি রাজ্যে একটি সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবি পেশ করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪ মে শ্রীমতী সীতারামন সংবাদমাধ্যমকে জানান— 'জম্মু-কাশ্মীরের শান্তি ও সম্প্রীত বিনষ্টকারী কোনও সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে বরদাস্ত করবে না ভারতীয় সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে সেনা।' প্রসঙ্গত, গত ৯ মে-র জম্মু-কাশ্মীরের সর্বদল বৈঠকের মূল বিষয় ছিল অতি দ্রুত রাজ্যের নিরাপত্তা-পরিস্থিতির অবনমন এবং সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর ক্রমাগত সংঘর্ষ বেড়ে চলা।

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে ভারত সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্ত নিলে পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়ে উঠতে পারতো। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্ত সর্বদাই ভারতের পক্ষে একতরফা ভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এর সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করেছে একের পর এক ঘটনায়। পাক-মৌলবাদী ও ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্রমাগত কাশ্মীরের নাগরিকদের ভারতীয় সেনার বিরোধিতায় মদত দিয়েছে। সম্প্রতি সেখানকার এক শিক্ষকের জঙ্গিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় এই তত্ত্বই পুনরায় প্রকাশ্যে এসেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সব জেনেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কীভাবে মুফতি সংঘর্ষ-বিরতির দাবি তুললেন তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

সীতারামন তাঁর বিবৃতিতে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অঞ্চল থেকে সন্ত্রাস দূর করতে হলে সেনার কড়া পদক্ষেপ প্রয়োজন। সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনও সমঝোতা নয়। আমরা পদক্ষেপ করবোই।' সীতারামন সাংবাদিকদের জানান যে, তিনি সমর-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারত সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্ত নিলে সন্ত্রাসবাদীদেরই বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে। এতে তারা পুনঃসংগঠনের সুযোগ পাবে।

দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই সাংবাদিক সম্মেলনের আগে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হয়। মেহবুবা সাংবাদিকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন সর্বদল বৈঠকে বিজেপি-সহ সবকটি রাজনৈতিক দলই চলতি সপ্তাহে রমজানের আরম্ভ থেকে অমরনাথ যাত্রার শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভারত-সরকারের কাছে আর্জি জানাতে ঐকমত্য হয়েছে। যদিও রাজ্য বিজেপি পরে সরাসরি জানিয়ে দেয় এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তারা সহমত নয়। ভারতীয় সেনাও এই সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্তে তাদের তীব্র আপত্তির কথা জানিয়েছিল। সেনার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, তাদের সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকেই জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসী আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেবে।

নির্মলা সীতারামন তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে স্মরণ করিয়ে দেন নওয়াজ শরিফের সাম্প্রতিকতম স্বীকারোক্তির কথা, যেখানে পাক-প্রধানমন্ত্রী ২৬/১১-র মুম্বই হানার ঘটনায় তার দেশের জড়িত থাকার কথা সরাসরি জনসমক্ষে মেনে নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারত সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্ত নিলে যে আখেরে পাকিস্তানের লাভই হতো, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না কূটনীতিকদের। যদিও ভারত-সরকার কোনওভাবেই এই ফাঁদে পা দেয়নি।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

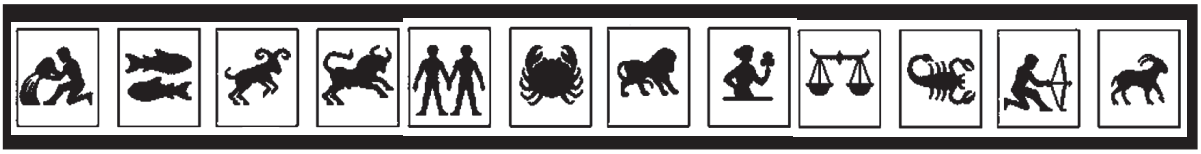

২১ মে (সোমবার) থেকে ২৭ মে (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে বুধ, বৃষে রবি, মিথুনে শুক্র, কর্কটে রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল এবং কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে অশ্বিনী থেকে কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্রে।

মেষ : শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলের শুভ। বাড়ি-ব্যবসায় বিনিয়োগ। উত্তেজক কথাবার্তা ও জেদ পরিহার করুন। বন্ধু স্থানীয় কারও উপকারে লাগতে পারেন, আর্থিক শুভ। অংশীদারী ব্যবসায় ভাল ফললাভ। যুবক-যুবতীদের নতুন যোগাযোগ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা।

বৃষ : শরীরের যত্ন নিন। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রকাশ ও শংসা প্রাপ্তি। গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ, কর্মের যোগসূত্রে দূর দেশে গমন। বিদ্যার্থীদের শুভ, বাড়ি-গাড়ি-রসনা তৃপ্তির যোগ। কারও মন্তব্যে অভিমান, ব্যয়। গুরুজন বিষয়ে উদ্বেগের অবসান, কর্মে উন্নতি। প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সাফল্য।

মিথুন : গৃহে অনুষ্ঠান। দৃষ্টিশক্তি, চর্ম ও অস্থির চিকিৎসায় উদ্বেগ। শত্রু হ্রাস ও গৃহসুখ। ছলনাময়ীর কৌশলে বুদ্ধিনাশ। প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃস্থান হিতকারী। স্ত্রী অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি। ইলেকট্রনিক্স-পরিবহণ বিষয় শুভ ইঙ্গিত বহনকারী।

কর্কট : কর্মে সিদ্ধিলাভ হলেও প্রাপ্তির ক্ষেত্র আশাব্যঞ্জক নহে। বিদ্যার্থীর শুভ, শিল্পী-কলাকুশলী-ভাল লাগা ও ভালবাসা বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ। পূজারী-মঠাধ্যক্ষ-জ্যোতিষীদের মান্যতা। তীর্থদর্শন তবে ব্যয়াধিক্য।

সিংহ : কলহ-বিবাদে বিষণ্ণতা। শরীরের যত্নের প্রয়োজন। ধন-সম্পদ-বিদ্যা ও সৃজনশীলতায় পারদর্শিতা লাভ। শৌখিন ব্যবসায় শুভ তবে নতুন বিনিয়োগ নিষেধ। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণের যোগ। বুদ্ধিমত্তায় পারিবারিক চাপমুক্তি।

কন্যা : অগ্রজদের সান্নিধ্য ও সুপরামর্শ প্রাপ্তি। রুচিসম্মত খাদ্য ও পোশাকে তৃপ্তি। বিদ্যার্থীর গবেষণায় মান্যতা। ব্যবসায় শুভ। গৃহে বন্ধু-আত্মীয় সমাগম। অর্থাগমের নতুন দিগন্তের উন্মোচন। শিল্পী- কলাকুশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজর অথবা স্ত্রীর ব্যবসার প্রসার। কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি থাকলেও মানসিক অতৃপ্ত ভাব।

তুলা : অপূরণীয় বাসনার পূর্ণতা, জ্ঞানের গরিমা ও উৎসাহ বৃদ্ধি। শরীরের মধ্যাঙ্গের অস্ত্রোপচার। লটারি-শেয়ারে বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি। সৃজনশীলতার প্রকাশ। অপ্রিয় সত্য মানসিক অস্থিরতার কারণ। গুরুজন বিষয়ে স্বস্তি। আয়ের শ্লথ গতি। কর্মক্ষেত্রে ভাবমূর্তি ভাল থাকলেও সন্তানের কারণে উদ্বেগ। উৎসাহ আনন্দ-মিত্রলাভ।

বৃশ্চিক : কীট-পতঙ্গ, বিষক্রিয়া থেকে সতর্ক থাকুন। পারিবারিক পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য উন্নতি। সামাজিক ও সৃষ্টিধর্মী কাজে যুবতীর সহায়তা হিতকারী ও ফলপ্রসূ। উদ্যমের সার্থক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। জটিল বিষয় ও পরিস্থিতির সরলীকরণ। আর্থিক শুভ।

ধনু : জেদের কারণে ভাল সুযোগ হাতছাড়া। বিদ্যা-জ্ঞান ও আর্থিক শুভ। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত। প্রকাশনা-গ্রন্থাগার ও শিক্ষার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের ইতিবাচক শুভ। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান,পাণ্ডিত্য, অনায়াস সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভ। বকেয়া কাজ ও প্রাপ্তিতে বাধা। পরে অনুকুল পরিবেশ। সদর্থক পদক্ষেপ ও সার্থকতা।

মকর : প্রমোটিং ও দালালি ব্যবসায় শুভ হলেও সময়টা সুখকর নহে। সামাজিকতা ও মানবিক গুণের প্রকাশ। গুণীজনের শংসা প্রাপ্তি। বিরূপ পরিস্থিতি উদ্বেগ ও অস্বস্তির কারণ। শিল্প, সংস্কৃতি ও সহদরের ক্ষেত্র শুভ ও মানসিক প্রশান্তি। শান্ত-সংযত ভাবে গৃহসুখ বজায় রাখুন। বিদ্যার ক্ষেত্র প্রশস্ত।

কুম্ভ : কর্মে নব উদ্যোগ ও নতুন দিশা। হৃদযন্ত্রের চিকিৎসা প্রয়োজন। উপার্জনের প্রচেষ্টায় স্বল্প প্রাপ্তি, নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি। ক্লান্তি, হতাশা, জটিলতা। পত্নীর ক্ষেত্রে আর্থিক শুভ। অংশীদারী ব্যবসা ও অন্যের পরামর্শ এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় দূরদেশে গমন ও বাধামুক্ত পরিবেশ।

মীন : যুবক বন্ধু হিতকারী। আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয়। স্বীয় প্রচেষ্টায় সাফল্য। অচলায়তন ভেঙে বিদ্যা ও ব্যবসায় নতুন দিশা। প্রতিবেশী ও মিত্রস্থান হিতকারী নয়। অধস্তনের চালাকি সুসম্পর্কের অন্তরায়। আত্মীয় সমাগমে স্বাচ্ছন্দবোধ। আশাব্যঞ্জক সুখবর পেতে পারেন।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য